আধুনিক ভারত পরিচয়

শ্রীঅমর প্রসাদ দাশ গুপ্ত
এম্. এ. (কলি.) পি এইচ্. ডি (লণ্ডন)
স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মেডালিষ্ট
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের ভূতপূর্ব লেকচারার,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহের ভূতপূর্ব কন্ট্রোলার এবং
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ সমূহের বর্তমান পরিদর্শক

ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন
৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৯

প্রকাশক :
প্রতুল চন্দ্র ঘোষ
৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৯

প্রথম সংস্করণ—ডিসেম্বর ১৯৬০

মূল্য ২·৭৫ নয়া পয়সা

মুদ্রাকর :
কার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১নং কৈলাস বোস :
কলিকাতা—৬

ভূমিকা

ভারতের বিগত দুই শতাব্দীর ইতিহাস, অর্থাৎ বৃটিশদের অধীনে ভারতের ইতিহাস, এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। যখন ভারতে কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল, ভারতীয় নৃপতিগণ পরস্পরের সহিত অবিরাম যুদ্ধে লিপ্ত, জনসাধারণের পক্ষে আত্মরক্ষার চিন্তাই এত প্রবল যে উচ্চতর আদর্শ লুপ্তপ্রায়, সেই দুর্দিনে ভারতের পশ্চিম দুয়ারে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি বণিকবেশে উপস্থিত হয়। সমগ্র ভারতে বৃটিশদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। ভারতবাসী আত্মরক্ষার চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া জীবনের উচ্চতর কর্তব্যে মনোযোগী হইতে পারে। পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাধারার সহিত আমরা পরিচিত হই এবং আমাদের জীবন নূতন আদর্শে গঠিত করার জন্য আমরা ব্যগ্র হইয়া উঠি। ভগবৎ কৃপায় এই সময়ে ভারতে বহু মনীষীর জন্ম হয় এবং তাঁহারা দেশবাসীর মনে আত্মমর্যাদা, আত্মপ্রত্যয় ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করেন। ভারতবাসী সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য সচেষ্ট হয়। প্রায় অর্ধশতাব্দী অবিরাম সংগ্রামের ফলে তাহারা স্বাধীনতা লাভ করে। বিগত শতাব্দীর মধ্যে ভারতের দ্রুত পরিবর্তন হয় এবং ভারত সকল ক্ষেত্রে আধুনিক জগতের অন্যতম রাষ্ট্র রূপে স্থান গ্রহণ করে। অতএব এই গ্রন্থ আধুনিক ভারতের জন্ম বৃত্তান্ত।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ দ্বারা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত ইতিহাসের পাঠক্রম অনুসরণে এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। পাঠ্য পুস্তক রচনা করিতে গিয়া আমরা প্রায়ই কোন শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীর জন্য লিখিতে বসিয়াছি, তাহাদের বয়সই বা কত, তাহা ভুলিয়া যাই। ফলে পাঠ্যক্রম প্রবর্তকদের উদ্দেশ্য বিফল হয় এবং অপরিণত বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের উপর যে বোঝা চাপান হয় তাহা তাহাদের পক্ষে দুর্বহ হইয়া উঠে। এই গ্রন্থখানি রচনার সময়ে এই কথাই সর্বদা মনে রাখিয়াছি এবং প্রবর্তিত পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু যত সরল ও সহজবোধ্য ভাবে এই শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত করা যায়, সে বিষয়ে সচেষ্ট হইয়াছি। এই চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে তাহা শিক্ষক, শিক্ষিকা, ও ছাত্রছাত্রীরাই বলিতে পারিবেন।

কলিকাতা
২৮-১২-৬০

সূচীপত্র

মানচিত্রের তালিকা

আধুনিক ভারত পরিচয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইউরোপীয় বণিকদের আগমন

সূচনা

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের সহিত এশিয়ার যে সম্বন্ধ স্থাপনের সূচনা হয় তাহা পূর্বেকার ইতিহাসের তুলনায় বিভিন্ন প্রকৃতির। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ইউরোপের সহিত এশিয়ার বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। এক এক সময় এশিয়ার কোন শক্তি ইউরোপ আক্রমণ করিয়াছে, আবার ইউরোপীয় কোন জাতি এশিয়া আক্রমণ করিয়াছে। পারস্যরাজ জারাক্সিস (Xerxes) ইউরোপ আক্রমণ করিতে গিয়া গ্রীক্‌দের নিকট পরাস্ত হন। তারপর মধ্য এশিয়া হইতে হুনরা মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপ বিধ্বস্ত করে। আরবরা সমস্ত উত্তর আফ্রিকা দখল করিয়া স্পেনের কিয়দংশে নিজেদের রাজত্ব স্থাপন করে। তুর্কীরা দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ দখল করে এবং আরও অগ্রসর হইবার কালে অষ্ট্রিয়ানদের দ্বারা ড্যানিয়ুব নদীর তীরে বাধা পায়। অপর দিকে দেখিতে পাই ম্যাসিডন-অধিপতি আলেকজাণ্ডার সমস্ত পশ্চিম এশিয়া জয় করিয়া ভারতে সিন্ধুনদ পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তাহার পর রোমীয়গণ এশিয়া মাইনরে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। যাহা হউক্, এশিয়ার কোনও শক্তি বা ইউরোপের কোনও শক্তি একে অপরের উপর কোনও গভীর ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাহার কারণ সেকালে দূরবর্তী কোনও দেশের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা সহজ ছিল না।

আধুনিক যুগে যখন ইউরোপীয় জাতিরা পৃথিবীর চারিদিকে বাণিজ্যের লোভে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে তখন শিল্প-বিপ্লবের ফলে ও বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহাদের কাছে দূরত্ব আর বাধারূপে রহিল না এবং তাহারা তাহাদের প্রভাব পৃথিবীর সর্বত্র দৃঢ়ভাবে বিস্তার করিতে লাগিল। বর্তমানে ইউরোপীয়

সভ্যতা সকল দেশের নিজস্ব সভ্যতা ও কৃষ্টির উপর পলিমাটির ন্যায় বিস্তৃত রহিয়াছে।

মধ্যযুগে ইউরোপীয়দের ভৌগোলিক জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশ সমূহ ব্যতিরেকে তাহারা অন্যান্য দেশের বিষয় জানিত না। দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়রা যীশুখৃষ্টের জন্মস্থান জেরুসালেম্ মুসলমানদের নিকট হইতে উদ্ধারকল্পে দলে দলে প্যালেস্টাইন্ অভিমুখে যাত্রা করে। দেশ ছাড়িয়া যাইবার ফলে তাহারা পৃথিবীর পূর্বাঞ্চলের বিষয়ে অনেক খবর পায় এবং সেই সকল দেশের সম্বন্ধে তাহাদের কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। মার্কো পোলো প্রভৃতি পর্যটকদের কাহিনী শুনিয়াও ভারত ও চীন নামক কিংবদন্তীর দেশগুলি দেখিবার উৎসাহ জন্মায়। তারপর আসে একটি যুগ যখন ইউরোপীয়দের মনে পৃথিবীর অজানা দেশগুলির সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ তীব্র হয় এবং ইহার ফলে তাহারা নানাদিকে অভিযান আরম্ভ করে।

ভারত ও চীনের সহিত সরাসরি বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপনের ইচ্ছাও এই সকল অভিযানের মূলে ছিল। এই সকল দেশ হইতে সূতার ও সিল্কের কাপড় ও নানারকম মনিমুক্তা ও মশলা ইউরোপের বাজারে বিক্রয় হইত। আরব বণিকগণ এই সকল পণ্যদ্রব্য আরবসাগর ও লোহিতসাগরের পথে ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থিত বন্দরগুলি পর্যন্ত আনিয়া দিত। ইতালীয় বণিকরা উহা ক্রয় করিয়া ইউরোপের নানাদেশে অত্যন্ত অধিক দরে বিক্রয় করিত। স্পেন, পর্তুগাল ও ইংলণ্ডের লোকেরা ইতালীয়দের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইল ও কিভাবে ভারতে পৌঁছিয়া নিজেরা ব্যবসায় করিতে পারে তাহার জন্য চিন্তা করিতে লাগিল। এই সকল দেশের লোকেরা নৌচালনায় বিশেষ দক্ষ ছিল। তাহার পর দিকনির্ণয় যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে সমুদ্রে যাতায়াত অনেক সুবিধা হইল। ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগর দিয়া এশিয়া যাইবার পথ ইতালীয় ও আরব বণিকদের হস্তগত ছিল। সেইদিকে যাতায়াতের সুবিধা না থাকাতে এই সকল পশ্চিম ইউরোপীয় লোকেরা ভারতে পৌঁছিবার নূতন পথ আবিষ্কারের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। পৃথিবী গোলাকার, অতএব আটলান্টিক মহাসাগর দিয়া সোজা পশ্চিম অভিমুখে

যাইলে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতে পৌঁছান যাইবে, এই ধারণায় স্পেনীয় অভিযানের নেতা কলম্বাস ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় পৌঁছিলেন।

ভাস্কো-দা-গামা

উত্তর আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের সহিত পর্তুগীজদের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা কতদূর বিস্তৃত তাহা তাহারা জানিত না। এখন তাহারা আফ্রিকা ঘুরিয়া ভারতে পৌঁছিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে বার্থোলোমিউ ডিয়াজ নামক একজন পর্তুগীজ নাবিক আফ্রিকার দাক্ষিণতম অন্তরীপটি ঘুরিয়া পূর্ব উপকূল দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হন। এই অভিযানের ফলে আফ্রিকা দক্ষিণে কতদূর-বিস্তৃত পর্তুগীজরা তাহা জানিতে পারে। দশবৎসর পরে ভাস্কো-দা-গামা নামে আর একজন পর্তুগীজ নাবিক উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে মেলিন্দা নামক স্থানে উপনীত হন। এই স্থানের লোকেরা সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ভারতে পৌঁছিবার পথ জানিত। ভাস্কো-দা-গামা তথা হইতে পথ প্রদর্শক লইয়া ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছিলেন। এই সময়ে কালিকট জামোরিন উপাধিধারী এক হিন্দু রাজার অধীনে ছিল। জামোরিন দা-গামার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করেন। কিন্তু স্থানীয় আরব বণিকদের নিকট বাধাপ্রাপ্ত হওয়াতে পর্তুগীজরা ব্যবসায়ে বিশেষ সুবিধা করিতে পারিল না।



ভাস্কো-দা-গামা

ভারতীয় মহাসাগর অঞ্চলে পর্তুগীজ প্রাধান্য

১৫০০ খৃষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজা পেড্রো, আলভারেজ্ ক্যাব্রালের অধীনে ভারতে এক নৌবহর প্রেরণ করেন। ক্যাব্রাল্ কালিকটে এক বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন এবং ক্যানানোরে ও কোচিনে বেশ ভাল ব্যবসায় আরম্ভ করেন। মুসলমান বণিকদের নিকট ব্যবসায়ে বাধা পাওয়াতে পর্তুগীজরা তাহাদের উপর নৃশংস অত্যাচার করে। পর্তুগালের রাজা পোপের নিকট হইতে ইথিওপিয়া, আরব, পারস্য ও ভারতের অধিপতি এই উপাধি গ্রহণ করিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে পর্তুগীজদের ভারতের দিকে অভিযান কেবলমাত্র ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ছিল না, পূর্বজগতে সাম্রাজ্য স্থাপনও তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল।

১৫০৫ হইতে ১৫০৯ পর্যন্ত ভারতে পর্তুগীজ রাজার প্রতিনিধি ছিলেন ফ্রান্সিস্কো-ডি-আল্মিডা। তিনি বলেন যে ভারত মহাদেশে নানা স্থান অধিকার করার নীতি অনুসরণ করা পর্তুগালের পক্ষে ভুল হইবে। পর্তুগাল ক্ষুদ্র দেশ। জনবলের অভাবে এই দেশের পক্ষে এই সকল স্থান নিজেদের অধিকারভুক্ত রাখা অসম্ভব। কয়েকটি মাত্র কুঠী স্থাপন করিয়া বাণিজ্য চালানই উচিত হইবে এবং তাহাও সম্ভব হইবে যদি পর্তুগীজরা নৌ-বলের সাহায্যে সমুদ্রপথের উপর আধিপত্য অটুট রাখিতে পারে। তাঁহার পর পর্তুগীজ গভর্ণর নিযুক্ত হন আল্ফন্সো-ডি-আল্বুকার্ক্। তিনি বলেন যে ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য কয়েকটি স্থান অধিকার করিয়া পর্তুগীজদের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা আবশ্যক। এই সকল উপনিবেশে পর্তুগীজদের সহিত স্থানীয় লোকের বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিলে



আল্বুকার্ক

পর্তুগালের প্রতি অনুরক্ত প্রজাদলের সৃষ্টি হইবে। যেখানে দেশ অধিকার করা সম্ভব নহে সেখানে দুর্গ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যেখানে তাহাও সম্ভব নহে সেখানে স্থানীয় অধিপতিদের পর্তুগালের রাজার বশ্যতা স্বীকার করাইতে হইবে। এই নীতি অনুসরণে তিনি ১৫১০ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের সুলতানের রাজ্যভুক্ত প্রধান বন্দর গোয়া দখল করিলেন এবং গোয়াতে পর্তুগীজ শাসনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন। ম্যাসিডন অধিপতি আলেকজাণ্ডারের পর প্রথম গোয়াই ইউরোপীয় শাসিত ভারতের ভূখণ্ড। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ফরাসীরা তাহাদের ভারতে অধিকৃত অংশগুলি ছাড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু পর্তুগীজরা এখনও সেইরূপ উদারতা প্রদর্শন করিতে পারে নাই।

ইহার পর আল্‌বুকার্ক আরব বণিকদের বিতাড়িত করিয়া এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে সমগ্র ব্যবসায় পর্তুগীজদের হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চীন, জাপান ও মশলাদ্বীপগুলির সমস্ত পণ্যদ্রব্য মালাক্কা প্রণালীর মধ্য দিয়া পশ্চিম জগতে যাইত। মালয় উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত মালাক্কা সহর এই ব্যবসায়ের জন্য প্রধান বন্দর ছিল। এইখানে আরব, চীনা, গুজরাটি, বাঙ্গালী ইত্যাদি বহুজাতীয় লোক ব্যবসায় উপলক্ষে বাস করিত। আল্‌বুকার্কের অধীনে পর্তুগীজরা মালাক্কা অধিকার করিয়া তথায় একটি দুর্গ নির্মাণ করিল (১৫১১খৃঃ)। লোহিতসাগরের পথ দখল করিয়া মুসলমান বণিকদের বিপন্ন করার উদ্দেশ্যে পর্তুগীজরা ইহার পর এডেন দখল করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হয়। কিন্তু তাহারা পারস্য উপসাগরের অর্মুজ দ্বীপটি দখল করে। অর্মুজ সেকালে ঐ অঞ্চলের একটি সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায় কেন্দ্র ছিল। পশ্চিম ভারতে গোয়া ব্যতীত আরও কতকগুলি স্থান পর্তুগীজরা দখল করিয়াছিল, যথা বোম্বাই-এর উত্তরে দমন ও কাঠিওয়ারের দক্ষিণে দিউ দ্বীপ। বঙ্গোপসাগরেও তাহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি হয় এবং তাহারা মোগল সম্রাটের অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়া বাংলাদেশে তৎকালীন বন্দর সাতগাঁওর উত্তরে কুঠী নির্মাণ করে। এই স্থান হুগলী বলিয়া পরিচিত।

পর্তুগীজরা অত্যন্ত অত্যাচারী ছিল। পশ্চিম ভারতে বহু লোককে তাহারা বলপূর্বক খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করে এবং সে ধর্ম ত্যাগ করিলে

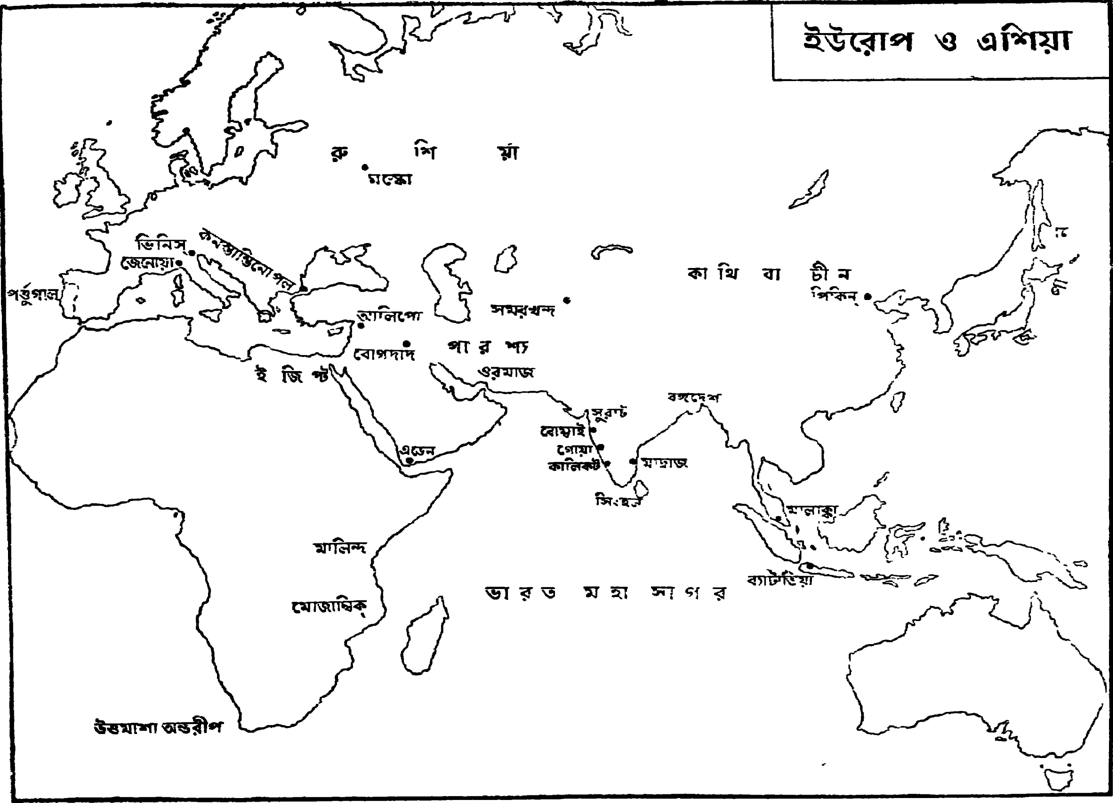
আগুনে পোড়াইয়া মারে। তাহারা দাস ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল ও ভারতীয় শিশু হরণ করিয়া বিক্রয় করিত। তাহাদের অত্যাচার অসহ্য হওয়ায় সম্রাট শাজাহানের আজ্ঞায় বাংলার শাসক হুগলীতে তাহাদের কুঠী ধ্বংস করেন।

ওলন্দাজ ও পর্তুগীজদের মধ্যে প্রতিযোগিতা

পর্তুগীজরা প্রায় একশত বৎসর পূর্বজগতের সহিত বাণিজ্যে একাধিপত্য করে। তাহার পর ওলন্দাজরা ও ইংরাজরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করে। ওলন্দাজরা ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের উত্তরে পুলিকটে প্রথম দুর্গ নির্মাণ করে। তাহার পর নেগাপত্তনে তাহারা বসতি স্থাপন করে। কিন্তু ওলন্দাজরা ভারতের সহিত ব্যবসায়ের অপেক্ষা পূর্ব এশিয়ার সহিত ব্যবসায়ের দিকে অধিকতর আগ্রহ দেখায়। যবদ্বীপে ব্যাটাভিয়া তাহাদের প্রধান কেন্দ্র হয়। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে তাহারা পর্তুগীজদের নিকট হইতে মালাক্কা বন্দর কাড়িয়া লয়। ইহার ফলে পূর্ব এশিয়ার ব্যবসায় তাহাদের হাতে চলিয়া যায়। সিংহল দ্বীপ হইতেও ওলন্দাজরা পর্তুগীজদের বিতাড়িত করে।

ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে ইংরাজদের আগমন

পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের ন্যায়, দিনেমার, ইংরাজ ও ফরাসীরাও পৃথিবীর পূর্বাংশের সহিত বাণিজ্য করিয়া লাভবান হইতে প্রয়াসী হইল। ১৬০০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" নামে এক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে পূর্বজগতে বাণিজ্য করিবার একচেটিয়া অধিকার দিয়া একটি সনন্দ প্রদান করিলেন। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদের একটি জাহাজ সুরাটে আসে এবং পর্তুগীজদের বাধা সত্ত্বেও কিছু ক্রয়বিক্রয় করে। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরা গুজরাটের মোগল রাজপ্রতিনিধির সহিত একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করে। ইহার ফলে তাহারা সুরাট ও ক্যাম্বে অঞ্চলে ব্যবসায় করিবার অধিকার পায় এবং পর্তুগীজদের সহিত এক জলযুদ্ধে জয়ী হইয়া সুরাটে একটি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স্ স্যার টমাস রোকে তাঁহার দূত হিসাবে সম্রাট জাহাঙ্গীরের


ইউরোপ ও এশিয়া
রুশিয়া
মস্কো
ভিনিস
জেনোয়া
কনস্তান্তিনোপল
পর্তুগাল
আলিপো
বোগদাদ
পারশ্য
ওরমাজ
সমরখন্দ
কাথি বা চীন
পিকিন্
ইজিপ্ট
এডেন
মালিন্দ
মোজাম্বিক্
উত্তমাশা অন্তরীপ
সুরাট
বোম্বাই
গোয়া
কালিকট
মাদ্রাজ
সিংহল
বঙ্গদেশ
মালাক্কা
ব্যাটাভিয়া
ভারত মহাসাগর

দরবারে প্রেরণ করেন। স্যার টমাস রো ভারতে তিন বৎসর অবস্থান করেন ও মোগল সম্রাটের নিকট হইতে ইংরাজদের জন্য বহু সুবিধা আদায় করেন। ভারতের পশ্চিম উপকূলে ইংরাজরা অনেকগুলি কুঠী স্থাপন করে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহারা বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করিয়া ভারতের পূর্ব উপকূলে বাণিজ্যকুঠী স্থাপন করে। এই দিকে ইংরাজদের প্রথম বসতি হয় মৎসলিপত্তনে। তাহার পর আরমাগাঁও নামক স্থানে তাহারা একটি দুর্গ নির্মাণ করে। এই স্থানগুলিতে ব্যবসাবাণিজ্যের অসুবিধা হওয়ায় মৎসলিপত্তন কুঠীর প্রধান কর্মচারী ফ্রান্সিস ডে চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে, পর্তুগীজ বসতি সান থোমের উত্তরে, দৈর্ঘ্যে ছয় মাইল এবং প্রস্থে এক মাইল একটি জায়গা বার্ষিক ৬০০ পাউণ্ড খাজনায় ইজারা লইলেন। এই স্থানে ফ্রান্সিস ডে একটি কুঠী ও দুর্গ নির্মাণ করাইলেন। তিনি ইহার নাম দিলেন ফোর্ট সেণ্ট্‌-জর্জ। পরে এই স্থানেই মাদ্রাজ সহর গড়িয়া উঠে।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগালের রাজার নিকট হইতে বিবাহের যৌতুক হিসাবে বোম্বাই দ্বীপটি প্রাপ্ত হন। কয়েক বৎসর পরে তিনি এই দ্বীপটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বার্ষিক দশ পাউণ্ড খাজনায় পত্তনি দেন। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দের পর সুরাটের পরিবর্তে বোম্বাই পশ্চিম ভারতে ইংরাজদের প্রধান কেন্দ্র হয়।

মাদ্রাজে বসতি স্থাপনের পূর্বেই ইংরাজরা উড়িষ্যার উপকূলে হরিহরপুর নামক স্থানে কুঠী স্থাপন করিয়াছিল। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে তাহারা বাংলাদেশে হুগলীতে কুঠী স্থাপন করিল। ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে বাংলার শাসনকর্তা, সম্রাট শাজাহানের পুত্র শুজা, বার্ষিক তিন সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে ইংরাজদের বাংলাদেশে বাণিজ্য করার অধিকার দিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব ইংরাজদের দেয় বাণিজ্য শুল্ক ও জিজিয়া কর নির্ধারিত করিয়া দেন। স্থানীয় কর্মচারীরা ইহার অতিরিক্ত কর দাবী করাতে ইংরাজরা এই সকল কর আদায়ে বাধা দিল। ফলে ইংরাজদের সহিত মোগল সম্রাটের প্রতিনিধিদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে হুগলীর ফৌজদার ইংরাজদের কুঠি লুণ্ঠন করিয়া তাহাদের তাড়াইয়া দিলেন। পর বৎসর হুগলীর কুঠির প্রধান জব চার্ণক

মোগল সম্রাটের বিশেষ অনুমতি প্রাপ্ত হওয়াতে বাংলায় ফিরিয়া আসিলেন। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে ইংরাজ ও মোগল কর্মচারীদের সংঘর্ষের খবর ইংলণ্ডে পৌঁছায়। ফলে ইংরাজরা দশখানি যুদ্ধের জাহাজ বাংলায় প্রেরণ করে। এই অভিযান সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় এবং ইংরাজদের আবার বাংলা ছাড়িয়া যাইতে হয়। ওদিকে সুরাট হইতে তাহারা বিতাড়িত হয়। যাহা হউক ইংরাজ ও মোগলদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইলে পর বাংলার শাসনকর্তা ইব্রাহিম খাঁ জব চার্ণককে ফিরিয়া আসিতে অনুমতি দিলেন। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে প্রত্যাবর্তন করিয়া জব চার্ণক যেখানে বর্তমান কলিকাতা নগর অবস্থিত সেইখানে কুঠি স্থাপন করিলেন। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে এইখানে ফোর্ট-উইলিয়ম দুর্গ নির্মিত হয়। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরা কলিকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম ১২০০ টাকা খাজনায় ইজারা লইল। এই তিনটি গ্রাম লইয়াই কলিকাতা সহর গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ইংরাজরা যুদ্ধ বিগ্রহ এড়াইয়া চলে।

কর্ণাটকে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিযোগিতা

ফরাসীরা অনেক পরে ভারতের ব্যবসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। ফরাসী-রাজ চতুর্দশ লুইর অর্থমন্ত্রী কলবার্টের প্রেরণায় ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা পণ্ডিচেরীতে কুঠি স্থাপন করে। ইউরোপে ওলন্দাজদের সহিত ফরাসীদের যুদ্ধ হওয়াতে তাহারা ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিচেরী দখল করে। ইউরোপে যুদ্ধাবসান হইলে পর ওলন্দাজরা ফরাসীদের পণ্ডিচেরী ফিরাইয়া দেয়। পণ্ডিচেরী স্থাপনের কাছাকাছি সময়ে ফরাসীরা বাংলাদেশে চন্দননগরে বসতি স্থাপন করে। মালাবার উপকূলে মাহে এবং কোরমণ্ডল উপকূলে কারিকল, এই দুই স্থানেও ফরাসীরা ব্যবসায়ের জন্য কুঠি স্থাপন করে। ফরাসীরা ব্যবসায়ে কোনও দিনই ইংরাজদের ন্যায় প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই এবং তাহাদের বসতিগুলি কোনও সময়েই শক্তিতে, সম্পদে ও ব্যবসায়ে ইংরাজদের কুঠিগুলির সমান হইতে পারে নাই।

ইংরাজদের ভারতে আগমন ও বসতি করার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য। কিন্তু ফরাসীদের ব্যবসা ব্যতিরিকে সাম্রাজ্য স্থাপনেরও আকাঙ্ক্ষা তীব্র ছিল। ইউরোপে এই দুই জাতির মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তাহার উপরে ভারতেও তাহাদের স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। অতএব পরস্পরের মধ্যে এই দেশে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়িল।

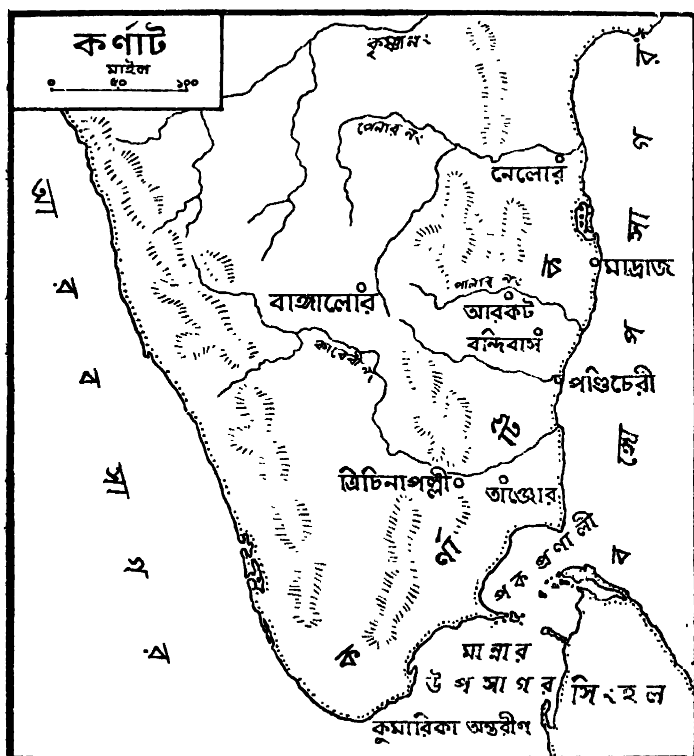
দুইটি বিদেশী জাতি ভারতে আসিয়া পরস্পরের সহিত কি ভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হইল, এই কথা বুঝিতে হইলে তৎকালীন ভারতের অবস্থা পর্যালোচনা করা আবশ্যক। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে যাঁহারা আরোহণ করিলেন তাঁহারা দুর্বল প্রকৃতির ছিলেন। মোগলদের রীতি অনুযায়ী প্রত্যেক সম্রাটেরই মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া কাড়াকাড়ি হইত। যাঁহার জয় হইত তিনি বিশেষক্ষমতাসম্পন্ন না হইলে সাম্রাজ্যের ঐক্য রক্ষা করা অসম্ভব হইত। তাহার পর আওরঙ্গজেব দূরদৃষ্টির অভাবের জন্য যে নীতি অনুসরণ করিযাছিলেন তাহার ফলে দিল্লীর সম্রাটরা রাজপুতদের আনুগত্য ও সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইল, শিখজাতির অভ্যুদয় হইল ও মারাঠা শক্তি জাগ্রত হইল। অন্যদিকে পারস্যরাজ নাদিরশাহের আক্রমণ মোগল শক্তিকে বিশেষভাবে দুর্বল করিল। এই অবস্থায় মোগলদের অধীনে যে সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইয়া পড়িলেন। কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবে ভারতে অরাজকতার সৃষ্টি হইল। স্থানীয় শাসকরা স্বার্থের সন্ধানে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। ইতিহাসে সকল সময়েই দেখা গিয়াছে যে শাসকদের দুর্বলতা ও গৃহবিবাদের ফলে দেশ বিদেশী শক্তির অধীনে চলিয়া যায়। ভারতেও তাহাই হইল। ইংরাজ ও ফরাসীরা এই ছিদ্রের সন্ধান পাইয়া ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল এবং আমাদের দুর্বলতা কতদূর তাহা জানিতে পরিয়া আত্মশক্তির উপর অধিকতর আস্থাবান হইল।

কোরমণ্ডল উপকূলে ইংরাজ ও ফরাসীরা যে স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল তাহা কর্ণাটক নামে পরিচিত। কর্ণাটকের রাজধানী ছিল আর্কট। কর্ণাটকের নবাব ছিলেন হায়দ্রাবাদের নিজামের অধীনে। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে

কর্ণাটকের নবাব দোস্ত আলি মারাঠাদের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন। দোস্ত আলির জামাতা চাঁদা সাহেব নবাব পদের প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু নিজাম তাঁহার একজন কর্মচারী আনোয়ার উদ্দীনকে নবাবের পদে নিযুক্ত করিলেন। ইহার ফলে কর্ণাটকে যথেষ্ট অসন্তোষের সৃষ্টি হইল।

কর্ণাটকের প্রথম যুদ্ধ

এই সময়ে ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল। এই যুদ্ধ ইতিহাসে অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ (Austrian Succession



War) বলিয়া পরিচিত। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ইহার অবসান হয়। প্রথমে ভারতে ইংরাজ ও ফরাসীরা নিরপেক্ষ থাকিবার

সিদ্ধান্ত করে। কিন্তু ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধের সূত্র ধরিয়া এই দুই জাতির মধ্যে ভারতেও সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। প্রথমে ইংরাজরা একটি পণ্যবাহী ফরাসী জাহাজ দখল করে। বঙ্গোপসাগরে ফরাসীদের কোনও যুদ্ধের জাহাজ ছিল না। ভারতে ফরাসী শাসনকর্তা ডুপ্লে উপায়ান্তর না দেখিয়া মরিশাসের শাসনকর্ত্তা লাবুর্দনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। লাবুর্দনে আটখানি জাহাজ লইয়া ভারতে উপস্থিত হইলেন এবং মাদ্রাজ অবরোধ করিলেন। ইংরাজরা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া লাবুর্দনের সহিত সন্ধি স্থাপন করিল। ৪৪ লক্ষ টাকার বিনিময়ে লাবুর্দনে মাদ্রাজ ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ডুপ্লে কিছুতেই রাজী হইলেন না। ইংরাজরা তখন কর্ণাটকের নবাবের নিকট আবেদন করিল। দুইটি বিদেশীয় বণিকদল তাহার রাজ্যের একটি অংশ অধিকারের জন্য যুদ্ধ করিতেছে এই অবস্থাতে যদি নবাব রুষ্ট না হইতেন তাহা হইলেই অস্বাভাবিক ছিল। তিনি ডুপ্লেকে মাদ্রাজ হইতে ফরাসী সৈন্য অপসারণের আজ্ঞা দিলেন। ডুপ্লে নবাবের এই আজ্ঞা অমান্য করিলে পর নবাব ফরাসীদের মাদ্রাজ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য এক বিরাট সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন। আনওয়ার উদ্দীনের সৈন্য মাদ্রাজে ফরাসীদের অবরুদ্ধ করিল, কিন্তু ফরাসীরা তাহাদের হটাইয়া দিল। নবাবের সৈন্য পশ্চাদপসরণ করিবার কালে ফরাসীদের একটি অপেক্ষাকৃত ছোট সৈন্যদলের হাতে পরাস্ত হইল। এই সংঘর্ষের ফলে বুঝা গেল যে ইউরোপীয় সামরিক প্রণালীতে শিক্ষিত সৈন্য সংখ্যায় অল্প হইলেও দেশীয় নৃপতিগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু অশিক্ষিত সৈন্যদল অপেক্ষা শক্তিশালী। ইউরোপীয়দের আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদা বাড়িয়া গেল।

নবাবের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইলেও ফরাসীরা ইংরেজদের নিকট হার মানিল। ইংরাজদের ইতিহাসে বহুবারই দেখিতে পাওয়া যায় যে ভাগ্যদেবতা স্বহস্তে তাহাদের রক্ষা করিতেছেন। এবারেও তাহা হইল। এক প্রবল ঝড়ে লাবুর্দনের নৌবহর ধ্বংসপ্রায় হইল। বঙ্গোপসাগরে ইংরাজদের নৌশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না। নৌশক্তির অভাবে ভারতে ফরাসীরা অসহায় হইয়া পড়িল। ডুপ্লে দীর্ঘকাল অবরোধ করিয়াও ইংরাজদের সেন্ট-ডেভিড্ দুর্গ দখল

করিতে পারিলেন না। ইংরাজরা ফরাসীদের উপর পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করিল এবং জল ও স্থল উভয় দিক হইতেই পণ্ডিচেরী অবরোধ করিল। এই সময়ে ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে সন্ধি সাক্ষরিত হওয়াতে ডুপ্লে ইংরাজদের মাদ্রাজ প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন।

কর্ণাটকের দ্বিতীয় যুদ্ধ

ডুপ্লে দেখিলেন যে ইংরাজদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফরাসীদের জয়ের সম্ভাবনা খুবই কম, কারণ তাহাদের নৌশক্তি প্রবলতর; ফরাসীদের প্রতিপত্তি কর্ণাটকেই এক প্রকার সীমাবদ্ধ কিন্তু ইংরাজরা বোম্বাই ও বাংলায় বেশ দৃঢ়ভাবে স্থাপিত। অতএব তাহাদের ভারত হইতে বিতাড়ন সাধারণভাবে অসম্ভব। তিনি নূতন উপায়ের কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার সুশিক্ষিত সৈন্যদল সংখ্যায় কম হইলেও নবাবের সৈন্যদলকে পরাস্ত করিয়াছে; এই সামরিক শক্তি ব্যবহার করিয়া তিনি ভারতের রাজনৈতিক দলাদলির মধ্যে প্রবেশ করিবেন এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিবেন। সুযোগ শীঘ্রই আসিল। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদের সুবাদার নিজাম-উল্-মুল্কের মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র নাসীর জঙ্গ মসনদ লাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার দৌহিত্র মুজফ্ফর জঙ্গ নিজামের পদ পাইবার জন্য দাবী করিলেন। অপর দিকে কর্ণাটকের গদির জন্য চাঁদা সাহেব আনোয়ার উদ্দীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ডুপ্লে উভয়েরই ইচ্ছাপূরণ করাইবেন এই সর্তে চাঁদা সাহেব ও মুজফ্ফর জঙ্গের সহিত গোপন সন্ধি করিলেন। ইংরাজরা নাসির জঙ্গের পক্ষ লইল। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা, চাঁদা সাহেব ও মুজফ্ফর জঙ্গ মিলিত হইয়া ইংরাজদের মিত্র


ডুপ্লে

আনোয়ার উদ্দীনকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। এই যুদ্ধে আনোয়ার উদ্দীনের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র মহম্মদ্ আলি ত্রিচিনপল্লীতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু ফরাসী সৈন্য তাঁহাকে ত্রিচিনপল্লীতে অবরোধ করিল। নাসীর জঙ্গ শত্রুপক্ষ দমন করিবার জন্য কর্ণাটকে আসিলেন, কিন্তু নিহত হইলেন। ফলে ফরাসীদের মিত্র মুজফ্ফর জঙ্গ হায়দ্রাবাদের মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেন। প্রীত হইয়া মুজফ্ফর জঙ্গ ডুপ্লেকে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণস্থ তাঁহার রাজ্যের অংশের শাসনকর্তা নিয়োগ করিলেন এবং মৎসলিপত্তন ও পণ্ডিচেরীর নিকটস্থ কিছু জায়গা দান করিলেন। ডুপ্লে, বুসী নামক এক সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে একদল ফরাসী সৈন্য হায়দ্রাবাদের দরবারে অবস্থান করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে মনে হইবে যে দক্ষিণ ভারতে ইংরাজদের টিকিয়া থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই; ডুপ্লের পরিকল্পনা সফল হইয়াছে এবং ফরাসীদের সাহায্যে মুজফ্ফর জঙ্গ হায়দ্রাবাদে এবং চাঁদা সাহেব আর্কটে অধিষ্ঠিত। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ফরাসীরা উপেক্ষিত বণিকদলের অবস্থা হইতে দক্ষিণ ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা রূপে সমাসীন। মহম্মদ আলি ত্রিচিনপল্লীতে আত্মসমর্পণ করিলেই ইংরাজদের দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হইবে।

ইংরাজদের বুদ্ধিতে মহম্মদ আলী ডুপ্লের সহিত সন্ধিসর্তগুলি লইয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ডুপ্লে বুঝিতে পারিলেন না যে মহম্মদ আলি সাহায্যের অপেক্ষায় সময় কাটাইতেছেন। কিছুকালের মধ্যেই মহীশূরের অধিপতি ও মারাঠারা মহম্মদ আলি ও ইংরাজদের দলে যোগ দিলেন। ইংরাজরাও আর্কট অধিকার করিবার জন্য রবার্ট ক্লাইভের অধীনে দুইশত গোরা সৈন্য ও তিনশত সিপাহী প্রেরণ করিল। চাঁদাসাহেবের অধিকাংশ সৈন্য ত্রিচিনপল্লী অবরোধে নিযুক্ত ছিল। অতএব ক্লাইভ সহজেই আর্কট অধিকার করিলেন। তখন চাঁদা সাহেব ত্রিচিনপল্লী হইতে বহু সৈন্য আর্কটে প্রেরণ করিলেন। ক্লাইভ আর্কটে অবরুদ্ধ হইলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সাধিত হইল। চাঁদা সাহেবের সৈন্যদল ত্রিচিনপল্লী ও আর্কট এই দুইস্থানে বিভক্ত হওয়ার ফলে ত্রিচিনপল্লীতে মহম্মদ আলির মিত্ররা জয়ী হইলেন এবং

চাঁদা সাহেব আর্কট হইতেও ক্লাইভকে হটাইতে পারিলেন না। কিছুকাল পরে চাঁদা সাহেবের মৃত্যু হইল।

এই ভাগ্যবিপর্যয় সত্ত্বেও ডুপ্লে নিরাশ হইলেন না এবং ত্রিচিনপল্লী আক্রমণ করিলেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে কর্তৃপক্ষরা ভারতে তাঁহাদের কর্মচারীরা যুদ্ধ করিতেছে শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং শান্তি-স্থাপনের আদেশ দিলেন। ফরাসী সৈন্যের পরাজয়ের সংবাদে ফরাসী সরকার ডুপ্লের উপর বিরক্ত হইয়া একজন নূতন শাসনকর্তা প্রেরণ করিলেন এবং ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে ডুপ্লে দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

কর্ণাটকের তৃতীয় যুদ্ধ

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধের শেষ হয়। ইহা ইতিহাসে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (Seven Years' War) নামে পরিচিত। ভারতে ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এই যুদ্ধ উপলক্ষে কোনও উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ হয় নাই। ঐ বৎসর কাউণ্ট ল্যালী ভারতে ফরাসীদের সামরিক ও অসামরিক ব্যাপারে সর্বময় কর্তারূপে পণ্ডিচেরীতে আগমন করিলেন। তিনি প্রথমে ইংরাজদের সেণ্ট ডেভিড্ দুর্গ অধিকার করিলেন। তৎপরে তিনি মাদ্রাজ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তিনি মাদ্রাজ দখল করিতে পারিলেন না। স্থানীয় ফরাসীরা ল্যালীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। বেতন ও খাদ্যের অভাবে ফরাসী সৈন্যদের মনে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। অপরদিকে ইংরাজ নৌশক্তির নিকট ফরাসী নৌবহর পরাস্ত হইল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ল্যালী বন্দিবাসের যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি স্যার আয়ার কুটের নিকট পরাজিত হইয়া অতিকষ্টে পণ্ডিচেরীতে পৌঁছিলেন। ইংরাজরা তাঁহাকে সেখানে অবরুদ্ধ করিল। আট মাস বীরত্বের সহিত নগর রক্ষা করিবার পর খাদ্যাভাবে ল্যালীকে বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইল। ইংরাজরা পণ্ডিচেরী ধ্বংস করিয়া ফেলিল। অন্যান্য ফরাসী অধিকৃত স্থানগুলিও ইংরাজদের হাতে চলিয়া গেল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরা চন্দননগর দখল করিয়াছিল। এখন মাহে [illegible] খৃষ্টাব্দে

ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে ইউরোপে সন্ধি স্থাপিত হইল (Peace of Paris)। এই সন্ধির সর্তানুযায়ী ফরাসীরা তাহাদের হস্তচ্যুত স্থানগুলি ফিরিয়া পাইল। কিন্তু সামরিক শক্তি হিসাবে ভারতে ফরাসীদের স্থান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দি খাঁ বাংলার নবাব হন। তখন বাংলার নবাব দিল্লীর বাদশাহের কর্মচারী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন স্বাধীন নরপতি ছিলেন। আলিবর্দি খাঁ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মারাঠারা বারম্বার বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়া বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, সুতরাং তাঁহার অধিকাংশ সময়ই বাংলাদেশকে মারাঠাদের হাত হইতে রক্ষার ব্যাপারে কাটিয়া যায়। যখন তিনি অবসর পাইতেন তখনই বাংলার শাসন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেন।

সিরাজ্-উদ্দৌলা

আলিবর্দির কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁহার তিনটি কন্যার বিবাহ হয় তাঁহার তিনটি ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত। আলিবর্দি তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র সিরাজ্-উদ্দৌলাকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। এই কারণে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম জামাতারা অসন্তুষ্ট হন। ইঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন ঢাকার শাসনকর্তা ও অপরজন পূর্নিয়ার শাসনকর্তা।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দির মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে তিনি কিছুকাল অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। এই সময় হইতেই সিরাজ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম হইতেই সিরাজ শত্রুবেষ্টিত ছিলেন। তাঁহার মাতার

জ্যেষ্ঠা ভগিনী ঢাকার পরলোকগত শাসনকর্তার বিধবা পত্নী ঘষিটি বেগম এবং তাঁহার খুল্লতাতের পুত্র পূর্নিয়ার শাসনকর্তা সৌকত জঙ্গ তাঁহার সহিত শত্রুতা করিতেছিলেন। ঘষিটি বেগমের দেওয়ান ছিলেন রাজবল্লভ। রাজবল্লভ ও সৌকত জঙ্গ ইংরাজদের সহিত সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। ইউরোপে সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সংবাদে কলিকাতায় ইংরাজরা সিরাজের অনুমতি বিনা তাঁহাদের দুর্গ অধিকতর সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। সিরাজ তাহাদের এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বন না করিতে আদেশ দিলেন। তদুপরি যখন সিরাজের শত্রু রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস ঢাকা হইতে বহু ধনরত্ন লইয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসিলেন তখন তাহারা তাঁহাকে আশ্রয় দিল। সিরাজ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে ইংরাজরা তাঁহার বিপক্ষ দলে যোগ দিয়াছে। আলিবর্দি খাঁর মৃত্যুর পর সিরাজ যখন মসনদে বসিলেন তখন তিনি শত্রুদমনের জন্য তৎপর হইলেন। প্রথমেই তিনি ঘষিটি বেগমকে তাঁহার প্রাসাদে স্থানান্তরিত করিলেন। তাহার পর তিনি সৌকতজঙ্গকে দমন করিবার জন্য পূর্নিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজমহল পর্যন্ত অগ্রসর হইবার পর তাঁহার মনে হইল যে সৌকতজঙ্গের পূর্বে ইংরাজদের জব্দ করা আবশ্যক। অতএব তিনি মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন। প্রথমে তিনি ইংরাজদের কাশিমবাজার কুঠী দখল করিলেন। তাহার পর তিনি কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ফোর্ট উইলিয়মের শাসনকর্তা ড্রেক এবং অন্যান্য ইংরাজরা নদীবক্ষে অবস্থিত তাহাদের জাহাজগুলিতে আশ্রয় লইলেন। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ সহজেই সিরাজের



সিরাজউদ্দৌলা

হস্তগত হইল। সেনাপতি মানিকচাঁদকে কলিকাতায় রাখিয়া সিরাজ মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া গেলেন। ইতোমধ্যে দিল্লীর বাদশাহ সৌকতজঙ্গকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করিয়া সনন্দ প্রদান করেন। ঐ সনন্দের সাহায্যেই সৌকতজঙ্গ বাংলার নবাব পদে অধিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সিরাজ যুদ্ধে সৌকতজঙ্গকে পরাজিত করিলেন ও সৌকত নিহত হইলেন। এইভাবে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কয়েক মাসের মধ্যেই সিরাজ তাঁহার শত্রুত্রয়কে দমন করিলেন।

সাময়িকভাবে জব্দ হইলেও ইংরাজদের চিরকালের জন্য বিতাড়িত করিবার ক্ষমতা সিরাজের ছিল না, কারণ তাঁহার ছিল নৌশক্তির অভাব। সিরাজ বারংবার ইংরাজদের বাঙ্গালাদেশ হইতে তাড়াইলেও সমুদ্রপথে তাহাদের আধিপত্য থাকিবার ফলে ইংরাজদের পুনরায় ফিরিয়া আসা অসম্ভব ছিল না। সিরাজ কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়ম দখলের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মাদ্রাজের ইংরাজরা রবার্ট ক্লাইভ ও নৌসেনাপতি ওয়াট্‌সনের অধীনে এক নৌবহর প্রেরণ করিল। ইতোমধ্যে মাণিকচাঁদ, জগতশেঠ, উমিচাঁদ ও সিরাজের অন্যান্য শত্রুদের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। অতএব ক্লাইভের কলিকাতা দখল করিতে কোনও অসুবিধা হইল না (২রা জানুয়ারী ১৭৫৭ খৃঃ)। মাণিকচাঁদ যুদ্ধ করিবার ভান করিয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে পলায়ন করিলেন। ইংরাজরা অনায়াসে হুগলী লুণ্ঠন করিল। এই সময় হইতেই সিরাজের দৃঢ়তা ও কর্মতৎপরতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ইংরাজদের ঔদ্ধত্যের সমুচিত শাস্তি দিবার চেষ্টা না করিয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন (৯ই ফেব্রুয়ারী ১৭৫৭ খৃঃ)।



লর্ড ক্লাইভ

ইহা আলিনগরের সন্ধি নামে পরিচিত। সিরাজ ইংরাজের সকল দাবী মানিয়া লইলেন। ইংরাজরা বাংলাদেশে বাণিজ্য করিবার, কলিকাতায় দুর্গ সুরক্ষিত করিবার ও নিজেদের টাকশালে তৈয়ারী মুদ্রা ব্যবহার করিবার অধিকার পাইল। ইহার পর ইংরাজরা সিরাজের আপত্তিসত্ত্বেও চন্দননগর হইতে ফরাসীদের তাড়াইয়া দিয়া ঐ স্থানটি দখল করিল। সিরাজ ফরাসীদের রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করিলেন না, কিন্তু যে সকল ফরাসীরা পলাইয়া মুর্শিদাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করিল নবাব তাহাদের আশ্রয় দিলেন। চন্দননগরের অনতিদূরে হুগলীতে মহারাজা নন্দকুমারের অধীনে নবাবের বহু সৈন্য ছিল। নন্দকুমার ইংরাজদের কোনও বাধা দিলেন না। হয়ত নবাব তাঁহাকে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করিবার আজ্ঞা দেন নাই। সিরাজের আচরণের এই পরিবর্তন হওয়ার কোন কারণ স্পষ্ট বোঝা যায় না। বোধ হয় তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার কর্মচারীদের মধ্যে অধিকাংশই বিশ্বাসঘাতক। উত্তরপূর্বদিক হইতে শাহাজাদার আক্রমণের সম্ভাবনাও হয়ত তাহাকে এই সময়ে অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে বিরত করে।

যাহা হউক বাংলায় এইরূপ বিশৃঙ্খলার সুবিধা পাওয়ায় ইংরাজদের সাহস ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। তাহারা নিজেদের মনোনীত ব্যক্তিকে বাংলার মসনদে বসাইয়া কর্তৃত্ব করার সংকল্প করিল এবং এই উদ্দেশ্যে নবাবের বিরুদ্ধে যে গোপন ষড়যন্ত্র চলিতেছিল তাহাতে যোগদান করিল।

আলিবর্দি খাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁহার ভগিনীপতি মীরজাফর বাংলার নবাব হইবার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টা ব্যর্থ হইলে পর তিনি আলিবর্দি খাঁর নিকট শপথ করেন যে সিংহাসনে সিরাজের দাবী তিনি সমর্থন করিবেন। মীরজাফর ছিলেন সিরাজের প্রধান সেনাপতি। তিনি এখন পূর্বেকার শপথ ভুলিয়া গিয়া সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে নবাব হইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ইংরাজরা সেনাপতি রায়দুর্লভ, ধনকুবের জগৎশেঠ ও সিরাজের অন্যান্য শত্রুদের সহিত এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিল। মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইতে পারিলে সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে ইংরাজ কোম্পানী এবং উহার প্রধান কর্মচারীরা কি পুরস্কার পাইবেন সেই সকল সর্তসম্বলিত একটি

সন্ধিপত্রও স্বাক্ষরিত হইল (১০ই জুন ১৭৫৭ খৃঃ)। ষড়যন্ত্রকারীদের সমুচিত শাস্তি দিবার ব্যবস্থা না করিয়া সিরাজ মিরজাফরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং এইরূপ কার্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কপট মিরজাফর সিরাজকে বুঝাইলেন যে তিনি তাঁহারই পক্ষে আছেন। সিরাজও ঐরূপ বুঝিয়া তাঁহাকে সেনাপতি পদে বহাল রাখিলেন ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে ক্লাইভ সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত পলাশী নামক স্থানে উভয়পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হইল। মীরজাফর ও রায়দুর্লভ তাহাদের সৈন্যসহ নিষ্ক্রিয় রহিলেন। মোহনলাল ও মীরমদন তাঁহাদের অধীনে অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া ইংরাজদের আক্রমণ করিলেন। নবাবের সৈন্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে না পারিয়া ক্লাইভের সৈন্য নিকটস্থ আম্রকাননের মধ্যে আশ্রয় লইল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময় একটি গুলির আঘাতে মীরমদনের মৃত্যু হয়। সিরাজ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন এবং মীরজাফরকে সৈন্যসহ যুদ্ধে যোগদানের অনুরোধ করিলেন। মীরজাফর উপদেশ দিলেন যে মোহনলালকে যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়ার আজ্ঞা দেওয়া উচিত। সিরাজ আপত্তি করিলে মীরজাফর বলিলেন যে নবাবের পক্ষে যাহা ভাল সেইরূপই তিনি উপদেশ দিয়াছেন, ইহার পর নবাব ইচ্ছামত কাজ করিতে পারেন। সিরাজ এতদূর কাণ্ডজ্ঞানহীন হইলেন যে তিনি মোহনলালকে পশ্চাদপসরণ করিবার আজ্ঞা দিলেন। জয় অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া মোহনলাল আপত্তি জানাইলেন কিন্তু সিরাজ বারবার মোহনলালকে একই আজ্ঞা দিতে লাগিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া মোহনলাল পশ্চাদপসরণ করিতে লাগিলেন। এই সময় ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষের একদল নবাবী সৈন্য দ্রুত পলায়ণ করিতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া নবাবের আক্রমণকারী সৈন্যদের মধ্যে অদ্ভুত ভীতির সঞ্চার হইল এবং সকলেই উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন আরম্ভ করিল। ইংরাজদের ভাগ্যবলে নিশ্চিত পরাজয় জয়ে পরিণত হইল। সেইদিন সূর্য্যাস্তের সঙ্গে স্বাধীন বাংলার ভাগ্যসূর্যও অস্তমিত হইল।

পরদিন প্রাতে সিরাজ মুর্শিদাবাদে পৌঁছিলেন এবং তাঁহার সৈন্যদল পুনরায়

একত্র করিবার বহু চেষ্টা করিলেন। ইহাতে বিফল হইয়া ও পার্শ্ববর্তী কাহারও উপর বিশ্বাস স্থাপন না করিতে পারিয়া সিরাজ তাঁহার স্ত্রী ও বিশ্বস্ত এক ভৃত্যকে লইয়া বিহার অভিমুখে পলায়ন করিলেন। পথে ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে আনীত হইলেন। মীরজাফরের আজ্ঞায় তাঁহার পুত্র মীরণ সিরাজকে হত্যা করিল।

মীরজাফর

মীরজাফর বাংলার সুবাদার রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইংরাজদের যথেষ্ট পুরস্কার দিলেন। ক্লাইভ ও তাঁহার সহকর্মীরা প্রচুর উপঢৌকন পাইল। সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের ক্ষতিপূরণ হিসাবে যে মুদ্রা দাবী করা হইল মুর্শিদাবাদের কোষাগারে তাহা পাওয়া গেল না বলিয়া নবাব ইংরাজদের নিকট ঋণী রহিয়া গেলেন। তদুপরি ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী ২৪ পরগনার জমিদারী প্রাপ্ত হইল। ক্লাইভ যতদিন জীবিত থাকিবেন জমিদারীর আয় তিনি লাভ করিবেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ইহা কোম্পানীর প্রাপ্য হইবে এইরূপ ব্যবস্থা হয়। পলাশীর যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এই ঘটনার ফলে ইংরাজরা বাংলার সর্বময় কর্তা হইয়া পড়িল, বাংলার ব্যবসায় বাণিজ্য ও ধনসম্পদ তাহাদের অধিকারে আসাতে ভবিষ্যতে তাহাদের পক্ষে ভারতের উপর আধিপত্য স্থাপন করা সম্ভব হইল। ইংরাজদের হাত হইতে বাংলার মসনদ দান স্বরূপ গ্রহণ করার ফলে মীরজাফরের



মীরজাফর

কিছুমাত্র স্বাধীনতা রহিল না। তাঁহার প্রতি কার্যেই ক্লাইভ হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইংরাজদের ঔদ্ধত্যে মীরজাফর অস্থির হইয়া পড়িলেও বুঝিতে পারিলেন যে ইংরাজদের সাহায্য বিনা তাঁহার পক্ষে নিজ মসনদ রক্ষা করা অসম্ভব। মেদিনীপুর, পুর্ণিয়া ও পাটনার শাসনকর্তারা বিদ্রোহী এবং দিল্লীর বাদশাহের পুত্র আলী গহর (পরে দ্বিতীয় শাহ আলম্) বাংলা ও বিহার করায়ত্ত করার জন্য ইচ্ছুক। তদুপরি ছিল মারাঠা আক্রমণের ভীতি। অতএব ক্লাইভের সাহায্য নবাবের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া পড়িল। বস্তুতঃ বারংবার ক্লাইভের সাহায্যে মীরজাফর এই সকল বিপদ হইতে উদ্ধার পান। তথাপি ইংরাজদের তাড়াইবার জন্য মীরজাফর শ্রীরামপুরের ওলন্দাজদের সহিত গোপন ষড়যন্ত্র করেন। ব্যাটাভিয়া হইতে সাতখানি জাহাজ ওলন্দাজ সৈন্য বহন করিয়া বাংলায় উপস্থিত হয়। চন্দননগর ও চুঁচুড়ার মধ্যবর্তী বিদেরা গ্রামে ইংরাজদের সহিত ওলন্দাজদের যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে (১৭৫৯ খৃঃ) ওলন্দাজরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে পলাশীর যুদ্ধের সময় ক্লাইভ ইংরাজদের মাদ্রাজ কাউন্সিলের কর্মচারী ছিলেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বাংলা দেশে ইংরাজদের গর্ভনর পদ প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া ক্লাইভ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহার স্থানে ভ্যান্সিটার্ট গভর্ণর নিযুক্ত হইলেন।

ওলন্দাজদের সহিত ষড়যন্ত্র করিবার জন্য মীরজাফরের উপর ইংরাজরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল। তদুপরি মীরজাফর তাহাদের ঋণ শোধ করিতে পারিতে ছিলেন না। এই সকল কারণে ইংরাজরা মীরজাফরকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া তাঁহার জামাতা মীরকাশিমকে নবাব পদে বসাইবার সঙ্কল্প করিল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে ইংরাজদের ও মীরকাশিমের মধ্যে একটি গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইংরাজদের সাহায্যের বিনিময়ে মীরকাশিম তাহাদের বাকী ঋণ সম্পূর্ণ শোধ করিবেন এবং বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জিলা তাহাদের ছাড়িয়া দিবেন। কয়েক দিনের মধ্যে ভ্যান্সিটার্ট সেনাপতি কাইলড্ সহ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। ইংরাজদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করা অসম্ভব বুঝিয়া মীরজাফর পদত্যাগ করিলেন।

বিনা রক্তক্ষয়ে একটি রাজনৈতিক বিপ্লব সাধিত হইল। মীরজাফরের ন্যায় মীরকাশিমও ইংরাজদের সাহায্যে মসনদ লাভ করিলেন।

মীরকাশিম

মীরকাশিম মীরজাফরের অপেক্ষায় বহুগুণে যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। ইংরাজদের ক্রীড়নক হইয়া রাজত্ব করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। তিনি প্রথম হইতেই বাংলার প্রকৃত শাসনকর্তার মত চলিতে লাগিলেন। ইংরাজরা পদে পদে বুঝিতে পারিল যে মীরকাশিমকে মসনদে বসাইয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বিহারে নবাবের দেওয়ান ছিলেন রামনারায়ণ। মীরকাশিম রামনারায়ণের নিকট রাজস্বের হিসাব দাবী করিলেন। সন্তোষজনকভাবে হিসাব না দিতে পারার জন্য মীরকাশিম রামনারায়ণকে পদচ্যুত করিলেন ও তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন। রামনারায়ণ ইংরাজদের প্রিয়পাত্র ছিলেন, কিন্তু ভ্যান্সিটার্ট তাঁহার পক্ষ লইয়া নবাবের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিলেন না। ইহার পর নবাব বিহারের যে সকল জমিদার শাহজাদা আলি গহরকে সাহায্য করিয়াছিল তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত শাস্তি দিলেন।


মীরকাশিম

অল্পকালের মধ্যেই নবাব ও ইংরাজদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল। দিল্লীর বাদশাহের ফরমান বলে ইংরাজরা বহুদিনই বিনা শুল্কে ব্যবসা করিত। ইংরাজদের দস্তক বা ছাড়পত্র দেখাইলেই নবাবের কর্মচারী বিনা শুল্কে মাল ছাড়িয়া দিত। দিল্লীর বাদশাহ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এই সুবিধা প্রদান করেন। ক্রমশঃ কোম্পানীর কর্মচারীরা ব্যক্তিগতভাবে

ব্যবসায় আরম্ভ করে এবং কোম্পানীর ব্যবহার্য দস্তকের অপব্যবহার করিতে থাকে। ইংরাজ কোম্পানীর ব্যবসায় ছিল আমদানী ও রপ্তানী করা। কোম্পানীর কর্মচারীরা দেশের মধ্যে তাহাদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় চালাইবার জন্য বেআইনীভাবে এই দস্তকের সাহায্যে বিনা শুল্কে ব্যবসায় করিত। ফলে দেশীয় বণিকদের বিশেষ ক্ষতি হইতে লাগিল। মীরকাশিম এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভ্যান্সিটার্টের নিকট প্রতিবাদ জানাইলেন।

মীরকাশিম বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ইংরাজদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ অনিবার্য। তিনি ইংরাজদের নিকট হইতে দূরে থাকিবার উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন ও স্থানীয় দুর্গ সংস্কার করিলেন। তিনি মুঙ্গেরে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের একটি কারখানা স্থাপন করিলেন ও ওয়াল্টার রাইনহার্ড (সমরু) নামক এক ইউরোপীয়ের সাহায্যে তাঁহার সৈন্যদলকে উন্নত প্রথায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলেন। আর্মেনিয়াবাসী গুর্গিন খাঁ মীরকাশিমের গোলন্দাজ বাহিনীর নেতৃত্ব লাভ করিল।

বাণিজ্য শুল্ক ব্যাপারে কোনরূপ সমাধান না হওয়াতে মীরকাশিম দেশীয় বণিকদের বিনা শুল্কে ব্যবসা করিবার অনুমতি দিলেন। ইহার ফলে কোম্পানীর কর্মচারীরা অন্যায়ভাবে যে সুবিধা করিতেছিল তাহা আর রহিলনা। ইংরাজদের পাটনার কুঠীর অধ্যক্ষ এলিস্ অত্যন্ত উদ্ধত স্বভাবের ছিলেন। তিনি পাটনা সহর দখল করিবার চেষ্টা করিলেন। নবাব পাটনা কুঠীর সমস্ত ইংরাজদের বন্দী করিলেন। ইহার পর উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। কাটোয়ায় ও উদয়নালায় এবং মুঙ্গেরে পরাজিত হইয়া মীরকাশিম পাটনায় উপস্থিত হইলেন। তথায় ইউরোপীয় বন্দীদের প্রাণনাশ করিয়া তিনি অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলম মীরকাশিমকে বাংলা উদ্ধারে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বক্সারে এই ত্রিশক্তির সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ হইল। ইংরাজরা পুনরায় জয়ী হইল। বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার শেষ চেষ্টা বিফল হইল। মীরকাশিম দিল্লী অভিমুখে পলায়ন করিলেন। ইংরাজরা চুণার ও এলাহাবাদ দখল করিল। সুজাউদ্দৌলা রোহিলখণ্ডে আশ্রয় লইলেন ও শাহ আলম ইংরাজদের সহিত সন্ধি করিলেন।

মীরকাশিমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ইংরাজরা পুনরায় মীরজাফরকে নবাব বলিয়া ঘোষনা করে এবং তাঁহার নিকট হইতে ত্রিশ লক্ষ টাকা আদায় করে। বক্সারের যুদ্ধের পর বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলম তাঁহাকে বাংলার সুবাদার পদ দান করিয়া ফরমান পাঠান। কিন্তু মীরজাফর বৃদ্ধ হইয়াছিলেন ও কুষ্ঠ ব্যাধিতে ভুগিতে ছিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার মৃত্যু হইল। ইংরাজরা তাঁহার পুত্র নাজিমুদ্দৌলাকে বাংলার মসনদে বসাইল।

নাজিমুদ্দৌলা

এ যাবৎ ইংরাজরা বাংলার শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে নাই। এখন তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে যেহেতু নূতন নবাব বালকমাত্র সেই হেতু তাহার উপর রাজ্যের সমস্ত দায়িত্বভার দেওয়া সমীচীন নহে এবং ইংরাজদের মনোনীত একজন সহকারী সুবাদার নবাবের অধীনে থাকিয়া সকল রাজকার্য্য পরিচালনা করিবেন। মহম্মদ রেজা খাঁকে তাহারা এই পদে নিযুক্ত করিল এবং ইংরাজদের অনুমতি বিনা নবাব তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন না তাহা জানাইল। ইংরাজরা আরও স্থির করিল যে রাজস্ব বিভাগের বিভিন্ন শাখার কর্মচারীদের নিয়োগ ও অপসারণ তাহাদের অনুমতি বিনা করা চলিবে না। নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্য বা রাজস্ব আদায়ের জন্য যে কয়জন সিপাহী আবশ্যক তদধিক সংখ্যার সিপাহী নবাব রাখিতে পারিবেন না। নবাব যদি দিল্লীর বাদশাহের নিকট সনন্দের জন্য আবেদন করেন তাহা হইলে ইংরাজদের


নাজিমউদ্দৌলা

মাধ্যমে করিতে হইবে। এই সকল সর্ত সম্বলিত একটি সন্ধিপত্র নবাবের নিকট স্বাক্ষরের জন্য উপস্থিত করা হইল। নবাব প্রথমে আপত্তি করিলেও এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য হইলেন (২০শে ফেব্রুয়ারী ১৭৬০)। এই সন্ধিপত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইহার ফলে নবাব সামরিক শক্তিবিহীন হইলেন এবং ইংরাজরা রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ ও দ্বৈতশাসন

মীরকাশিমের সহিত যুদ্ধ, পাটনায় বহু ইংরাজ নিহত, এই সকল সংবাদ পাইয়া লণ্ডনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ক্লাইভকে লর্ড উপাধিতে ভূষিত করিয়া পুনরায় বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ কলিকাতা পৌঁছিলেন। মীরকাশিম, সুজাউদৌল্লা ও শাহ আলমের সহিত যুদ্ধের ফলে কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্যন্ত প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে ইংরাজদের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। কোম্পানীর পক্ষে এত বিস্তৃত অঞ্চল প্রত্যক্ষ-ভাবে শাসন করা অসম্ভব জানিয়া ক্লাইভ পর পর বাংলার নবাব, বাদশাহ এবং অযোধ্যার নবাবের সহিত বন্দোবস্ত করিলেন। এই সকল ব্যবস্থার ফলে বাহ্যতঃ শাসন ব্যবস্থা পূর্বেকার ন্যায়ই থাকিল। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ইংরাজদের নিকট হস্তান্তরিত হইল। সহকারী সুবাদার মহম্মদ রেজা খাঁ তাঁহার ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছেন শুনিয়া ক্লাইভ এক নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিলেন। সহকারী সুবাদারের পদ লোপ পাইল। রাজ্য পরিচালনার সকল ক্ষমতা চারিজন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হইল। মহম্মদ রেজা খাঁ হইলেন নায়েব (শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার কর্তা), মহারাজ দুর্লভরাম হইলেন দেওয়ান (রাজস্ব বিভাগের কর্তা) এবং জগৎশেঠ পরিবারের কুশলচাঁদ ও উদয়চাঁদ হইলেন ব্যবসায়বানিজ্য ব্যাপারে প্রধান। ইংরাজদের মন্ত্রণা সভার (কাউন্সিলের) একজন সদস্য মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিয়া রাজ্যপরিচালনা সংক্রান্ত সকল ব্যাপারের সংবাদ কলিকাতায় প্রেরণ করিতে লাগিলেন। উপরন্তু ক্লাইভ ব্যবস্থা করিলেন যে নাজিমউদ্দৌলা তাঁহার নিজস্ব সকল প্রকার খরচের বাবদ বার্ষিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকা লইবেন। বাকী বাংলার রাজস্ব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সৈন্য বাহিনী

রক্ষা, দিল্লীর বাদশাহকে কর দেওয়া ইত্যাদি যাবতীয় খরচের বাবদ দেওয়া হইবে। রাজ্যভারের সকল দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া বাংলার নবাব নাজিমউদ্দৌলা ইংরাজদের বৃত্তিভোগী মাত্র হইলেন। ইহার পর ক্লাইভ সম্রাট শাহ আলমের নিকট হইতে একটি সনন্দ আদায় করিলেন। শাহ আলম এই সনন্দের দ্বারা বাংলার নবাবের সহিত ক্লাইভ যাহা বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তাহা সমর্থন করিলেন। ক্লাইভ শাহ আলমকে আলাহাবাদ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল উপহার দিলেন, তৎপরিবর্তে শাহ আলম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া সনন্দ প্রদান করিলেন। কোম্পানী বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায় করিয়া শাহ আলমকে বাষক ২৬ লক্ষ টাকা দিবেন, এই সর্ত সাক্ষরিত হইল। (১২ই আগষ্ট ১৭৬৫)। অযোধ্যা প্রদেশের যে অংশ শাহ আলম পাইলেন তাহার অবশিষ্ট অংশ ক্লাইভ অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাকে প্রদান করিলেন। পরিবর্তে অযোধ্যার নবাব ক্লাইভকে



কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ

পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা দিলেন। বিহারের সীমান্তে অযোধ্যা ইংরাজদের উপর নির্ভরশীল একটি রাজ্যে পরিণত হইল।

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা ছিল মোগল সাম্রাজ্যের একাট সুবা। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার নবাব প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন হইলেও আইনতঃ তিনি ছিলেন দিল্লীর বাদশাহের সুবাদার। তাঁহার ক্ষমতা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, দেওয়ানী ও নিজামৎ। দেওয়ান হিসাবে তিনি রাজস্ব আদায় করিতেন ও রাজস্বের নির্দ্ধারিত অংশ দিল্লীর বাদশাহকে পাঠাইতেন। নাজিম হিসাবে তিনি তাঁহার শাসিত অঞ্চলে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন। শাহ আলমের প্রদত্ত সনন্দের ফলে ইংরাজ কোম্পানী বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত হইল। রাজস্ব বিভাগের উপর তাহারা যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল তাহা আইন সম্মত হইল। শান্তি ও শৃঙ্খলার ভার নাজিম হিসাবে বাংলার নবাবের হাতে রহিল। আর্থিক ও সামরিক ক্ষমতা ইংরাজদের হাতে থাকাতে বাংলার নবাব যে ভাবে দুর্বল হইয়া পড়িলেন তাহাতে তাঁহার পক্ষে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। ফলে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হইল। এদিকে রাজস্ব সম্বন্ধে কোম্পানীর কর্মচারীদের যথেষ্ট ধারণা ছিল না; রাজস্ব আদায়ের জন্য নিজের একটি সংস্থা গড়িয়া তোলা কোম্পানীর পক্ষে অসম্ভব ছিল। অতএব তাহারা এই ব্যাপারে দেশীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়া শুধু মোটামুটি আদায়ের তত্বাবধান করিতে লাগিল। এই দ্বৈত শাসনের ফলে বাংলার অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া উঠিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা অত্যন্ত অল্প বেতন পাইত। কিন্তু বাংলাদেশের অরাজক অবস্থার সুযোগে তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বহু অর্থ উপায় করিত। প্রতি বার নবাব পরিবর্তনের সময় ইহারা বহু অর্থ উপঢৌকন পাইত। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাহাদের কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ভাবে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এই নিষেধ সত্ত্বেও তাহারা এই ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করিত ও দেশের লোকের উপর নানারূপ অত্যাচার করিত। ক্লাইভ কোম্পানীর কর্মচারীদের পক্ষে কোনও প্রকার উপহার গ্রহণ নিষিদ্ধ করিলেন। তাহাদের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে বাণিজ্য করাও বেআইনী হইল। অতিরিক্ত লাভের পথ এই ভাবে বন্ধ হইয়া যাওয়াতে কোম্পানীর উর্দ্ধতন কর্মচারীরা ক্লাইভের উপর এই সকল নিষেধাজ্ঞা

তুলিয়া দিবার জন্য চাপ দিতে লাগিলেন। তখন ক্লাইভ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য না করিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকার এক ব্যবস্থা করিলেন। কোম্পানী নিজ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবসায় করিতে নিষেধ করিয়াছিল। ক্লাইভ একটি বাণিজ্য সমিতি গঠন করিলেন এবং এই সমিতি কোম্পানীর দ্বারা নিষিদ্ধ লবণ, পান ও অহিফেনে বাংলার মধ্যে ব্যবসা আরম্ভ করিল। লাভের কিছু অংশ তাহারা কোম্পানীকে দিত। এই বাণিজ্য সমিতিতে (society of trade) ক্লাইভের পাঁচখানি শেয়ার ছিল। দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় ক্লাইভ এইগুলি তাঁহার সহকর্মীদের ৩২০০ পাউণ্ডে বিক্রয় করেন। ইহা হইতেই এই বাণিজ্যে কি পরিমাণে লাভ হইত তাহা বুঝা যায়। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এই ভাবে ব্যবসা করা বন্ধ করিয়া দেয়।

সৈন্যদলেও সাধারণ সিপাহী ও সৈন্যাধ্যক্ষের বেতনের হার অল্প হওয়ার দরুণ তাহারা ভাতা পাইত। যুদ্ধের সময় দ্বিগুণহারে এই ভাতা দেওয়া হইত। মীরজাফর শান্তি কালেও দ্বিগুণ ভাতা দিতেন। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ক্লাইভ ইহা বন্ধ করিয়া দেন এবং কেবল যুদ্ধের সময় সৈনিকরা ভাতা পাইবে এই ঘোষণা করেন। ফলে নিম্নশ্রেণীর ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষরা একযোগে পদত্যাগ করিতে সিদ্ধান্ত করে। ক্লাইভ দৃঢ়হস্তে এই বিরোধিতা দমন করেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে ক্লাইভ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনে যাঁহারা অংশগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ক্লাইভের স্থান অতি উচ্চে। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে, মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে, তিনি কেরাণীর পদ লইয়া মাদ্রাজে আসেন। দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধের সময় তিনি লেখনী ত্যাগ করিয়া সৈন্যদলে যোগদান করেন। তাঁহারই বুদ্ধিতে চাঁদাসাহেবের সৈন্যদলের উপর জয়লাভ করা সম্ভব হয়। নৌসেনাপতি ওয়াট্‌সনের সহিত বাংলায় আসিয়া তিনি কলিকাতা পুনরুদ্ধার করেন এবং তাঁহারই ষড়যন্ত্রের ফলে সিরাজউদ্দৌলাকে পলাশীর রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে হয়। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ইংরাজদের পক্ষে অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল প্রত্যক্ষভাবে অধিকারভুক্ত করা সম্ভব নহে। অতএব তিনি মোগল সম্রাটের দেওয়ান হিসাবে গুপ্ত থাকিয়া

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার উপর ইংরাজদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা করেন। এই অঞ্চলের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিবার জন্য তিনি অযোধ্যাকে ইংরাজদের একটি অনুগত রাজ্যে পরিণত করেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে বহু অর্থ লইয়া স্বদেশে যান ও তাঁহার দেশবাসীর ঈর্ষার পাত্র হন। ভারতে তাঁহার কার্যাবলীর জন্য তিনি অভিযুক্ত হন ও পার্লামেণ্টের নিকট তাঁহাকে জবাব দিতে হয়। কিছুকাল পরে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায় ও ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আত্মহত্যা করেন। ক্লাইভ বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু তিনি দৃঢ়চিত্ত, ক্ষমতাবান ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

ক্লাইভের পর ভেরেল্‌ষ্ট্‌ কলিকাতার গভর্ণর হন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে কার্টিয়ার গভর্ণর পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার সময়ে বাংলায় দ্বৈতশাসনের কুফল প্রকট হয়। যে শস্যশ্যামল দেশ বহু নবাবের স্বৈরাচার সত্ত্বেও স্বর্ণপ্রসূ ছিল সেই দেশ শ্মশানে পরিণত হইল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বাংলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এই দুর্ভিক্ষ ১১৭৬ বঙ্গাব্দে হওয়ার দরুণ ইহা ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'আনন্দমঠ' গ্রন্থে এই দুর্ভিক্ষের বিবরণ ও ফলাফল সুস্পষ্ট ভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বাংলার এক তৃতীয়াংশ লোক এই দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারাইয়াছিল। যখন মানুষ বাঁচিবার জন্য মৃতব্যক্তির মাংস ভক্ষণ করিতেছিল তখন নায়েব মহম্মদ রেজা খাঁ উচ্চদরে বিক্রয়ের জন্য চাউল গুদামজাত করিয়া রাখিয়াছিল। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে এই ব্যক্তি যে রাজস্ব আদায় করে তাহার পরিমাণ ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের রাজস্বের অপেক্ষা অধিক। কি ভয়ানক অত্যাচারের ফলে এইরূপ পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা যাইতে পারে তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।

এই সকল সংবাদ পাইয়া লণ্ডনে কোম্পানীর কর্তৃকপক্ষগণ দ্বৈতশাসনের অবসান করাই সিদ্ধান্ত করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে কোম্পানীকে দেওয়ানের কাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া নিজেদের কর্মচারীদের দ্বারা রাজস্ব আদায় করিত হইবে। নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য তাঁহারা ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতে বৃটিশ শাসনব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন

ওয়ারেণ হেষ্টিংস ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে এক উচ্চ অথচ দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেরাণীপদ প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন। কিছুকাল পরে তিনি কাশিমবাজার কুঠীতে নিযুক্ত হন। সিরাজউদ্দৌলা কাশিমবাজার দখল করিলে হেষ্টিংস বন্দী হন, কিন্তু পলায়ন করিয়া অন্যান্য ইংরাজদের সহিত কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। নিজ প্রতিভাবলে হেষ্টিংস দশবৎসরের মধ্যে কলিকাতা কাউন্সিলের সদস্য হন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া যান। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজের কাউন্সিলের সদস্য হইয়া ভারতে পুনরাগমন করেন। তাঁহার কার্যক্ষমতায় প্রীত হইয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ৪০ বৎসর বয়সে তিনি এই পদ প্রাপ্ত হন।

শাসন সংস্কার

কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী বাংলায় নূতন শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ণ করিবার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালায় তখন সম্পূর্ণ অরাজক অবস্থা। তিনি দেখিলেন কোম্পানীর কর্মচারীরা কোম্পানীর কাজে অমনোযোগী এবং অধিকাংশই ব্যবসায়ে লিপ্ত। বাংলার আভ্যন্তরীন ব্যবসা তাহাদের হাতে একচেটিয়া। আইন, আদালত সকলই ক্ষমতাহীন, ডাকাতের দল চারিদিকে লুঠতরাজ করিতেছে।

হেষ্টিংস রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ণ ভার কোম্পানীর হাতে লইলেন। সেকালে একজন ইংরাজের পক্ষে আমাদের দেশের রাজস্ব আদায় ব্যাপারের জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করা দুরূহ ছিল। হেষ্টিংস ফারসী ও বাংলা

শিখিয়াছিলেন এবং উর্দু ও আরবীও অল্পবিস্তর জানিতেন। এই কারণে তাঁহার পক্ষে রাজস্ব সংক্রান্ত খুঁটিনাটির বিষয় জানা সম্ভব হয়। তিনি রাজকোশ ও তৎসংক্রান্ত কাছারি মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আনিলেন। রাজস্ব আদায়ের সমস্ত ব্যাপার পর্যবেক্ষণের জন্য কলিকাতায় 'বোর্ড অফ্ রেভিনিউ' স্থাপিত হইল। প্রতি জেলায় একজন ইংরাজ 'কালেক্টর' অর্থাৎ রাজস্ব আদায়কারী নিযুক্ত হইল। যাহারা সর্বাপেক্ষা বেশী টাকা দিতে স্বীকৃত হইল তাহাদের সহিত পাঁচ বৎসরের মেয়াদে জমির বন্দোবস্ত করা হইল। ইহা পাঁচশালা বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। হেষ্টিংস এইভাবে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন।



ওয়ারেণ হেষ্টিংস

হেষ্টিংস বিচার বিভাগেও হস্তক্ষেপ করিলেন। প্রতি জেলায় একটি দেওয়ানী ও একটি ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল এবং কলিকাতায় সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত নামে দুইটি আদালত স্থাপিত হইল। রাজস্ব বিভাগে ও বিচার বিভাগে হস্তক্ষেপ করার ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রকাশ্যভাবে বাংলার শাসন কর্তা হইল। হেষ্টিংস হিন্দুদের হিন্দুশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী এবং মুসলমানদের কোরাণ ও হাদিসের বিধি অনুযায়ী বিচার করার ব্যবস্থা করিলেন। বিচারকদের সাহায্য করিবার জন্য আদালতে হিন্দু পণ্ডিত ও মুসলমান মৌলবী নিযুক্ত করা হইল।

রাজকোষ ও প্রধান বিচারালয় মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হওয়াতে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের পর কলিকাতাই বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার তথা বৃটিশ ভারতের রাজধানী হয়। ১৪০ বৎসর কলিকাতা নগরী এই সম্মানে

অধিষ্ঠিত থাকে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়।

শাহ আলম ও সুজাউদ্দৌলার সহিত সম্বন্ধ

বাংলার নবাব শাসনের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য হেষ্টিংস তাঁহার মাসহারা কমাইয়া অর্দ্ধেক করিয়া দিলেন। বাদশাহ শাহ আলম মারাঠাদের নিকট আত্মসমর্পন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কর দেওয়ার অর্থ মারাঠাদের পুষ্ট করা। অতএব হেষ্টিংস বাদশাহের প্রাপ্য বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা পাঠান বন্ধ করিয়া দিলেন। বৃটিশ ভারতকে মারাঠা আক্রমণ হইতে রক্ষা করার জন্য হেষ্টিংস অযোধ্যার নবাবের সহিত বন্ধুত্ব বজায় রাখার নীতি অনুসরণ করেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে হেষ্টিংস বারাণসীতে গিয়া সুজাউদ্দৌলার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তথায় একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। হেষ্টিংস অযোধ্যার নবাবকে করা ও আল্লাহাবাদ ফিরাইয়া দিলেন। পরিবর্তে নবাব কোম্পানীকে ৫০ লক্ষ টাকা দিলেন। রোহিলাদের দমন করিবার জন্য নবাব সাহায্য চাহিলে কোম্পানী একদল সৈন্য পাঠাইবে এই চুক্তিও হইল।

রোহিলা যুদ্ধ

অযোধ্যার উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গা ও হিমালয়ের প্রান্তদেশের মধ্যবর্তী অঞ্চল রোহিলখণ্ড নামে পরিচিত। পেশোয়ারের দিক হইতে আগত আফগান জাতির রোহিলা শাখা এই প্রদেশ অধিকার করে বলিয়া ইহার নাম হয় রোহিলখণ্ড। মারাঠারা বারবার এই প্রদেশ লুণ্ঠন করে এবং রোহিলা সর্দার হাফিজ রহমৎ খাঁ অযোধ্যার নবাবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। রোহিলখণ্ডের উপর সুজাউদ্দৌলার লোভ ছিল। ইংরাজদেরও ইচ্ছা ছিল যে অযোধ্যার নবাবের অধিকৃত অঞ্চল গঙ্গানদীর দ্বারা উত্তর-পশ্চিমে বেষ্টিত হউক, কারণ তাহা হইলে বৃটিশ অধিকৃত উত্তর ভারত আরও নিরাপদ হইতে পারে। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সুজাউদ্দৌলা প্রতিশ্রুত সাহায্য দাবী করিলে পর হেষ্টিংস কর্ণেল চ্যাম্পিয়নের অধীনে একদল সৈন্য

প্রেরণ করিলেন। রোহিলারা শাজাহানপুরের নিকট মিরাণ কাটরা নামক স্থানে পরাজিত হইল ও হাফিজ রহমৎ খাঁ যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। রোহিলা প্রদেশ অযোধ্যার সহিত যুক্ত হইল।

নিয়ামক আইন (Regulating Act) : ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দ

বৃটেনের একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ভারতে এক সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছে, তাহাদের কর্মচারীরা ভারত হইতে বহু অর্থ লইয়া দেশে ফিরিয়া নবাবী করিতেছে, এই দেখিয়া বৃটেনের অনেক লোক ঈর্ষান্বিত হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অংশীদাররা মনে করিতে লাগিল যে তাহাদের লাভের অংশ আরও বেশী হওয়া উচিত। অথচ কোম্পানীর খরচ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়াতে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ অংশীদারদের সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছিল না। জনসাধারণের মধ্যে প্রশ্ন উঠিল যে এত বড় সাম্রাজ্য একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের হাতে ছাড়িয়া রাখা উচিত কি না। ভারতে কোম্পানীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে ইংলণ্ডে নানারূপ খবর পৌঁছিতে লাগিল। তখন অনেকেরই মত হইল যে ইংলণ্ডের রাজারই এই সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া উচিত। ভারতে কোম্পানীর কর্মচারীদের কার্যকলাপ অনুসন্ধান করিবার জন্য ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া কমন্স সভার দ্বারা নিযুক্ত কয়েকটি কমিটি বসে। একটি কমিটির সুপারিশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজকোষে কিছু অর্থ দিতে বাধ্য হয়। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী খরচ বহনে অসমর্থ হইয়া ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করে। তখন লর্ড নর্থ ছিলেন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী। তিনি এই সুযোগে কোম্পানীর উপর পার্লামেণ্টের অধিকার স্থাপন করিলেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যে আইন বিধিবদ্ধ হইল তাহা রেগুলেটিং অ্যাক্ট, অর্থাৎ নিয়ামক আইন নামে পরিচিত। ইহার পর একের পর এক আইনের দ্বারা পার্লামেণ্ট কোম্পানীর ক্ষমতা সঙ্কুচিত করে। কিন্তু ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের সাম্রাজ্য কোম্পানীর হাতেই থাকে; ঐ বৎসর ইংলণ্ডের রাণীকে প্রত্যক্ষভাবে ভারতের সাম্রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

এই নিয়ামক আইন দ্বারা ব্যবস্থা হয় যে কোম্পানীর পরিচালকগণ তাহাদের ভারতীয় কর্মচারীদের সহিত যে সকল চিঠি-পত্রাদি আদান-প্রদান করিবেন তাহা ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার নিকট পেশ করিতে হইবে। প্রতি ছয় মাস অন্তর কোম্পানী তাহাদের আয় ব্যয়ের হিসাব ইংলণ্ডের সরকারের নিকট দাখিল করিবে। ফোর্ট উইলিয়মের অধীন সমস্ত অঞ্চলের সামরিক ও অসামরিক ব্যাপারে শাসন ব্যবস্থা একজন গভর্নর জেনারেল ও চারিজন পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে। গভর্নর জেনারেল ও তাঁহার পরিষদের সভ্যেরা পাঁচ বৎসর মেয়াদে নিযুক্ত হইলেন। অত্যাবশক কারণ ব্যতীত বোম্বাই ও মাদ্রাজের গভর্নর ও কাউন্সিল, গভর্নর জেনারেল ও তাঁহার পরিষদের অনুমতি বিনা কোনও যুদ্ধ আরম্ভ করিতে বা কোনও সন্ধি করিতে পারিবে না। বৃটিশ ভারতে এক কেন্দ্রীয় সরকার সৃষ্টির এই প্রথম সূচনা। কলিকাতায় একটি প্রধান বিচারালয় (সুপ্রীম কোর্ট) স্থাপিত হইল। ইহাতে একজন প্রধান বিচারপতি ও তিনজন সাধারণ বিচারপতি নিযুক্ত হইলেন। এই আদালত দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তি করার অধিকার পাইল। শুধু বৃটিশ প্রজাদের মধ্যে মামলা বিচার করিবার ক্ষমতাই যে এই বিচারালয়ের ছিল তাহা নহে, কোনও ব্যক্তি কোন বৃটিশপ্রজা বা কোম্পানীর কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিলেই এই আদালতে শুনানী হইতে পারিত। সুপ্রীম কোর্টের উপর গভর্নর জেনারেল বা তাঁহার পরিষদের কোনও ক্ষমতা ছিল না।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রথম গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার পরিষদের সদস্যরা হইলেন জেনারেল ক্লেভারিং, কর্নেল মন্‌সন্‌, ফিলিপ্‌ ফ্রান্সিস্‌ ও রিচার্ড বারওয়েল। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বাল্যবন্ধু স্যার ইলাইজা ইম্পে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হন।

এই নিয়ামক আইনের ফলে বহু কলহের সৃষ্টি হয়। গভর্নর জেনারেলের সহিত তাঁহার পরিষদের, বিশেষ করিয়া ফিলিপ ফ্রান্সিসের, মনোমালিন্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ। সপরিষদ গভর্নর জেনারেলের সহিত বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বিবাদ বৃটিশ সাম্রাজ্যকে বিপন্ন করে। সুপ্রীম কোর্টের সহিত হেষ্টিংস ও তাঁহার পরিষদের কলহ বাংলায় বহু গোলযোগের সৃষ্টি করে।

হেষ্টিংসের সহিত পারিষদদের শত্রুতা ও নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড

কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ গভর্নর জেনারেলের নূতন পরিষদকে তাহাদের কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতির অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে প্রথম হইতেই হেষ্টিংসের পরিষদের মধ্যে দুই দলের সৃষ্টি হইল। ক্লেভারিং, মন্‌সন্‌ ও ফ্রান্সিস্‌ একপক্ষে গেলেন ও অপর পক্ষে রহিলেন হেষ্টিংস ও বার্‌-ওয়েল। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়াতে হেষ্টিংসের বিপক্ষই বেশী ক্ষমতাশালী হইল এবং যতদূর সম্ভব হেষ্টিংস গত দুই বৎসর যে নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহার পরিবর্তন করিতে লাগিল এবং তিনি যে কর্মচারীদের নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহাদের পদচ্যুত করিতে লাগিল। এমন কি হেষ্টিংসকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টায় তাহারা হেষ্টিংসের শত্রুদের উৎসাহ দিতে লাগিল। তাহাদেরই প্ররোচনায় মহারাজা নন্দকুমার হেষ্টিংসকে ঘুষ লইয়াছেন বলিয়া পরিষদের নিকট অভিযোগ করিলেন। হেষ্টিংসও নন্দকুমার তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন বলিয়া সুপ্রীম কোর্টের নিকট নালিশ করিলেন। বিচারে নন্দকুমার ছাড়া পাইলেন। এমন সময়ে মোহনপ্রসাদ নামে এক ব্যক্তি নন্দকুমার একটি দলিল জাল করিয়াছেন বলিয়া সুপ্রীমকোর্টে মোকদ্দমা আনিলেন। নন্দকুমার দোষী সাব্যস্ত হইলেন ও তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল। অনেকে বলেন যে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন এবং প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার মধ্যে হেষ্টিংসের হাত ছিল। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হেষ্টিংসের বাল্যবন্ধু ছিলেন বটে, কিন্তু এই বিচারে অপর তিনজন বিচারকও সম্পূর্ণভাবে অংশ-গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জুরীর বারজন সভ্য ও চারজন বিচারক সকলেই একমত হইয়া নন্দকুমারকে দোষী বলেন। সেকালে বিলাতী আইনে জাল করিবার অপরাধে প্রাণদণ্ড হইত। দেশীয় আইনে এইরূপ অপরাধে প্রাণদণ্ডের বিধান ছিল না। বিলাতী আইন অনুযায়ী নন্দকুমারকে শাস্তি দেওয়া অন্যায় হয়।

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে মন্‌সনের মৃত্যু হইল। ফলে পরিষদে হেষ্টিংসের বিপক্ষদল আর সংখ্যাগরিষ্ঠ রহিল না। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ক্লেভারিং পরলোক গমন

করিলেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিসের সহিত হেষ্টিংসের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হয়। ফ্রান্সিস আহত হন ও সুস্থ হইলে পর দেশে ফিরিয়া যান।

সুপ্রীম কোর্ট

নিয়ামক আইনে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতার সীমা স্পষ্ট ভাবে নির্ধারিত না থাকাতে অনেক গোলযোগের সৃষ্টি হয়। এই আদালতের সহিত সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের সম্পর্ক এবং দেশীয় বিচারালয়গুলির সহিত সম্বন্ধ অনির্দিষ্ট ছিল। সুপ্রীমকোর্টের বিচারকগণ তাঁহাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যবহার করিবার সুযোগ ছাড়িতে পারেন নাই। পাটনার মামলা ও কাশি জোড়ার মামলা ইহারই উদাহরণ।

হেষ্টিংসের পররাষ্ট্রনীতি: প্রথম ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধ

হেষ্টিংসের সময়ে উত্তর ভারতে মারাঠা ব্যতীত ইংরাজদের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কোনও শক্তি ছিল না। হেষ্টিংস কি ভাবে অযোধ্যা রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া উত্তর ভারতে ইংরাজ অধিকৃত এলাকা সংরক্ষণের চেষ্টা করেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে পেশোয়া মাধব রাও এর মৃত্যুর পর মারাঠা শক্তি অন্তর্বিরোধে দুর্বল হইয়া পড়ে। এই সুযোগে বোম্বাইএর ইংরাজরা কিছু লাভের আশায় মারাঠাদের দলাদলির মধ্যে অংশগ্রহণ করিল। মাধব রাও এর ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশোয়া হইয়াছিলেন। তাঁহার খুল্লতাত রঘুনাথ রাও এর চক্রান্তে তিনি নিহত হইলেন। রঘুনাথ রাও নিজেকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু নানা ফড়নবীশের নেতৃত্বে রঘুনাথের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী দল গঠিত হইল। তাহারা রঘুনাথকে পেশোয়া বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী হইল না। অল্পকাল পরেই নারায়ণ রাও এর বিধবা পত্নীর এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। নানা ফড়নবীশের দল এই শিশুকেই পেশোয়া বলিয়া গ্রহণ করিল এবং তাহার নামে রাজ্য চালাইবার জন্য এক পরিষদ গঠন করিল। এই অবস্থায় রঘুনাথ রাও ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ

মাসে বোম্বাই এর ইংরাজরা রঘুনাথের সহিত সুরাটের সন্ধি স্বাক্ষর করিল। ইংরাজরা রঘুনাথকে একদল সৈন্য ভাড়া দিতে রাজী হইল। পরিবর্তে রঘুনাথ ইংরাজদের সাল্‌সেট ও বেসিন ছাড়িয়া দিলেন ও ব্রোচ ও সুরাটের রাজস্বের একাংশ দিতে স্বীকৃত হইলেন। ইংরাজ সৈন্যের সাহায্যে রঘুনাথ রাও আনন্দ সহরের নিকট নানা ফড়নবীশের দলকে পরাজিত করিলেন।

বোম্বাইয়ের ইংরাজরা সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের অনুমতি বিনাই মারাঠাদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। সুরাটের সন্ধি স্থাপন করাতে হেষ্টিংসের কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাঁহার পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এইরূপে মারাঠাদের সহিত যুদ্ধ বাধানো অন্যায় হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিল এবং নানা ফড়নবীশের দলের সহিত মিটমাট করিবার জন্য কর্ণেল আপ্‌টন্‌কে পুণায় প্রেরণ করিল। আপ্‌টন্‌ ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে পুরন্ধরে মারাঠাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। ইংরাজরা রঘুনাথের পক্ষ ত্যাগ করিল। ব্যবস্থা হইল যে সুরাটের সন্ধি অনুযায়ী ইংরাজরা যে সকল সুবিধা পাইয়াছিল তাহা বজায় থাকিবে, উপরন্তু ইংরাজরা বারো লক্ষ টাকা পাইবে। রঘুনাথ পেশোয়ার নিকট হইতে মাসহারা পাইবেন ও পুণায় অবস্থান করিবেন। কিন্তু কোন পক্ষই পুরন্ধরের সন্ধির সর্ত পালন করিল না। বোম্বাই এর ইংরাজরা রঘুনাথকে আশ্রয় দিল। নানা ফড়নবিশও তাঁহার দিকের সর্ত মানিলেন না। কিছুকাল পরেই সুরাটের সন্ধি সমর্থন করিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের পত্র ভারতে পৌঁছিল। ইতোমধ্যে বোম্বাইএর ইংরাজরা রঘুনাথের পক্ষ লইয়া মারাঠাদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কিন্তু ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে পরাজিত হইয়া ইংরাজরা ওয়াড়গাঁও-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল। ইংরাজরা মারাঠাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সকল স্থানগুলি ছাড়িয়া দিবে ও রঘুনাথের পক্ষ ত্যাগ করিবে, এই ব্যবস্থা হইল। ওয়ারেণ হেষ্টিংস এই অপমানজনক সন্ধি অগ্রাহ্য করিলেন এবং কর্ণেল গডার্ডের নেতৃত্বে বাংলা হইতে একদল সৈন্য বোম্বাই প্রেরণ করিলেন। গডার্ড আমেদাবাদ ও বেসিন দখল করিলেন (১৭৮০ খৃষ্টাব্দ)। একদল ইংরাজ সৈন্য গোয়ালিয়র দখল করিল ও অপর একদল ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে

সিন্ধিয়ার সৈন্যদলকে পরাজিত করিল। ইংরাজরা নানাদিকে জয়ী হওয়ার ফলে মারাঠা নেতা মাহাদজী সিন্ধিয়া সন্ধির জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাঁহার মধ্যস্থতায় ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে সালবাইএর সন্ধি স্থাপিত হইল। ইংরাজরা নারায়ণ রাওয়ের পুত্র মাধব রাও নারায়ণকে পেশোয়া বলিয়া স্বীকার করিল। রঘুনাথের জন্য বার্ষিক ভাতার ব্যবস্থা হইল। সাল্‌সেট্ ইংরাজদের অধিকারে রহিয়া গেল। সিন্ধিয়া তাঁহার রাজ্যের ইংরাজদের দ্বারা অধিকৃত অঞ্চল ফিরিয়া পাইলেন।

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলে ইংরাজদের বিশেষ কোনও লাভ হইল না। তবে সালবাই-এর সন্ধির পর বিশ বৎসর মারাঠাদের সহিত যুদ্ধ না হওয়াতে ইংরাজদের পক্ষে অন্যান্য শত্রুদের সহিত বোঝাপড়া করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

১৭৭৯-১৭৮০ ইংরাজদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃসময় ছিল। ওয়াড়গাঁও-এর সন্ধির কথা আমরা পূর্বেই জানিয়াছি। ঐ বৎসর মারাঠারা, হায়দ্রাবাদের নিজাম এবং মহীশূরের হায়দার আলি ইংরাজদের ভারত হইতে তাড়াইবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়। এই ত্রিশক্তির মিলন যদি কিছুকালের জন্যও স্থায়ী হইত তাহা হইলে ইংরাজরা অত্যন্ত বিপন্ন হইত। এই সময়ে আমেরিকান উপনিবেশিকদের পক্ষ লওয়ার জন্য ফরাসীদের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং ভারতে তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হায়দার আলি কর্ণাটক অঞ্চল লুণ্ঠন করেন এবং ঐ বৎসর কাঞ্চিপুরমের নিকট হায়দার আলির পুত্র টিপু কর্ণেল বেলীর অধীনে এক ইংরাজ সৈন্যদলকে সম্পূর্ণ পরাজিত করেন।

হায়দার আলির অভ্যুদয়

এইখানে হায়দার আলি ও তাঁহার সহিত ইংরাজদের পূর্ব সম্বন্ধের কথা কিছু বলা দরকার। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহীশূর ওদেয়ার রাজবংশের অধীনে ছিল। এই বংশের রাজারা দুর্বল প্রকৃতির ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী নন্দরাজ প্রকৃতপক্ষে মহীশূরের সর্বময় কর্তা ছিলেন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে হায়দার আলির যখন মাত্র ৩৩ বৎসর বয়স, তখন তিনি নন্দরাজের অনুগ্রহে

ডিণ্ডিগুলের ফৌজদার নিযুক্ত হন। পরে তিনি ব্যাঙ্গালোর জিলা জায়গীর রূপে প্রাপ্ত হন এবং মহীশূরের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে হায়দার বেদনুর নামক স্থান অধিকার করিয়া মহীশূরের সীমা বৃদ্ধি করেন এবং প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে মহীশূরের রাজার মৃত্যু হইলে হায়দার নামে মাত্র একজন রাজা বসাইয়া নিজেই মহীশূরের কর্তা হন।


হায়দার আলি

হায়দার আলির অধীনে এক শক্তিশালী মহীশূরের অভ্যুত্থানে মারাঠারা বিচলিত হইয়া পড়ে এবং হায়দার আলির শক্তি খর্ব করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু নিজেদের অন্তর্বিরোধের জন্য তাহারা হায়দারের কোনও স্থায়ী ক্ষতি করিতে পারে নাই।

প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের ইংরাজরা নিজামকে হায়দারের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই সাহায্যের পরিবর্তে নিজাম উত্তর সরকার নামক প্রদেশটি ইংরাজদের ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন। মারাঠারাও নিজাম ও ইংরাজদের সহিত যোগদান করিল এবং মহীশূর রাজ্য আক্রমণ করিল। হায়দার বহু অর্থ দিয়া মারাঠাদের সহিত সন্ধি করিলেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে নিজাম ও ইরাজরা মহীশূর আক্রমণ করে, কিন্তু নিজাম হঠাৎ হায়দারের সহিত সন্ধি করিয়া বসেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে নিজাম পুনরায় হায়দারকে পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজদের দলে আসেন। যাহা হউক হায়দার বীরত্বের সহিত ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজের মাত্র পাঁচ মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। তখন ইংরাজরা হায়দারের

নির্দেশ মত সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। উভয় পক্ষ পরস্পরের বিজিত স্থানগুলি প্রত্যর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইল। হায়দারের কোন শত্রু তাঁহাকে আক্রমণ করিলে ইংরাজরা সামরিক সাহায্যদান করিতে স্বীকৃত হইল।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

১৭৭১ খৃষ্টাব্দে যখন মারাঠারা হায়দারের রাজ্য আক্রমণ করিল তখন ইংরাজরা হায়দারকে সাহায্য করিল না। ইহাতে হায়দার ক্ষুণ্ণ হইলেন। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে হায়দার, নিজাম ও মারাঠাদের সহিত ইংরাজদের বিপক্ষে যোগদান করেন। কিন্তু নিজামের অস্থির মতির জন্য এবং মারাঠারা নিজেদের ব্যাপারে বিব্রত থাকার কারণে এই ত্রিশক্তি মিলনের কোনও ফল হয় নাই। ফ্রান্স বিদ্রোহী আমেরিকান উপনিবেশিকদের পক্ষ অবলম্বন করাতে ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ভারতে ইংরাজরা ফরাসী অধিকৃত স্থানগুলি আক্রমণ করিল। পণ্ডিচেরী ইংরাজদের হস্তগত হইল। মালাবার উপকূলে মাহে ফরাসীদের একটি ঘাঁটি ছিল। এই সময়ে ইংরাজরা মাহে দখল করিল। মাহে বন্দর হায়দারের রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত ছিল। অতএব হায়দার ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে হায়দার প্রায় একলক্ষ সৈন্যসহ কর্ণাটক প্রান্তরে ঝড়ের মতন নামিয়া আসিলেন। তিনি পোর্টোনোভো ও কাঞ্চিপুরম লুণ্ঠন করিলেন। হায়দার আলির পুত্র টিপু কর্ণেল বেলীর অধীনে এক সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত করিলেন। মাদ্রাজের অবস্থা এইরূপ বিপন্ন দেখিয়া হেষ্টিংস প্রধান সেনাপতি স্যার আয়ার কুটকে দক্ষিণ ভারতে প্রেরণ করিলেন। হেষ্টিংসের কূটনীতির প্রভাবে বেরারের রাজা মাহদজী সিন্ধিয়া এবং নিজাম হায়দারের পক্ষ ত্যাগ করিলেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদের ভাগ্যাকাশ মেঘমুক্ত হইল। তাহারা বোম্বাই অঞ্চলে যেমন জয়ী হইতে লাগিল, মাদ্রাজ অঞ্চলেও তেমন তাহাদের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইল। এই বৎসর স্যার আয়ার কুট হায়দারকে পোর্টো-নোভোর যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। ইংরাজরা নেগাপত্তন ও ত্রিঙ্কোমালী দখল করিল। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী নৌসেনাপতি সুফ্রঁ্যা এক নৌবহর

লইয়া ভারত মহাসাগরে উপস্থিত হইলেন। ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে অনেকগুলি নৌযুদ্ধ হওয়াতে উভয়পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল, কিন্তু যুদ্ধের ফল অমীমাংসিত রহিল। স্থলযুদ্ধেও ফরাসীরা হায়দারের সহিত ইংরাজদের বিপক্ষ গ্রহণ করে। দক্ষিণ ভারতের ভবিষ্যত যখন এইরূপ অনিশ্চিত অবস্থায় তখন হায়দারের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল এবং ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি পরলোক গমন করিলেন। হায়দারের পুত্র টিপু বীরদর্পে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বোম্বাই হইতে প্রেরিত সেনাপতি ম্যাথিওস্‌কে সসৈন্যে বন্দী করিলেন। এই বৎসর ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে ভার্সাইয়ের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। ফলে টিপু ফরাসীদের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ইংরাজরা টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনের নিকটবর্তী হইল। এমন সময়ে মাদ্রাজের নূতন গভর্ণর লর্ড ম্যাকার্টনী শান্তি স্থাপনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং শ্রীরঙ্গপত্তনের নিকটবর্তী সৈন্যদলকে পশ্চাদপসরণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ইংরাজদের সহিত টিপুর ম্যাঙ্গালোর নামক স্থানে সন্ধি স্থাপিত হইল। উভয় পক্ষ পরস্পরের বিজিত রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকৃত হইল। হেষ্টিংস এই ব্যাপারে ম্যাকার্টনীর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন।



টিপু সুলতান

যাহা হউক ১৭৭৯ ও ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই ও মাদ্রাজে ইংরাজদের যে শোচনীয় অবস্থা হয় তাহা হইতে হেষ্টিংসেরই অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে ইংরাজরা রক্ষা পায়। এই সকল যুদ্ধের খরচ হেষ্টিংসকেই যোগাইতে হয়।

অতএব নানা অন্যায় উপায়ে তাঁহাকে অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। বারাণসীর রাজা চৈৎ সিংহের ও অযোধ্যার বেগমদের প্রতি তাঁহার ব্যবহারের জন্য তিনি ইংলণ্ডের কমন্স সভার নিকট অভিযুক্ত হন এবং আজিও তিনি ইতিহাসে নিন্দনীয় হইয়া আছেন। উপরিউক্ত ব্যক্তিদের সহিত তাঁহার ব্যবহার বুঝিতে হইলে ঐ সময়ে ভারতে ইংরাজদের যে অবস্থা হয় তাহার পরিপ্রেক্ষিতে দেখিতে হইবে।

চৈৎ সিংহের প্রতি অসদাচরণ

হেষ্টিংসের সময়ে বারাণসী একটি করদ রাজ্য ছিল। রাজা চৈৎ সিংহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বার্ষিক সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা কর দিতেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরা বোম্বাই ও মাদ্রাজে যুদ্ধে লিপ্ত থাকাতে হেষ্টিংসের অর্থের প্রয়োজন হইল। তখন হেষ্টিংস চৈৎ সিংহের নিকট দেয় করের উপর আরও পাঁচ লক্ষ টাকা দাবী করিলেন। ১৭৭৮, ১৭৭৯ এবং ১৭৮০ এই তিন বৎসরে চৈৎ সিংহ ১৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত কর দিলেন। ইহার পর বিহার প্রদেশ রক্ষার জন্য হেষ্টিংস চৈৎ সিংহকে এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। চৈৎ সিংহ এই আদেশ পালন করিতে বিলম্ব করিলেন। চৈৎ সিংহের উপরে হেষ্টিংসের আক্রোশ ছিল, কারণ তিনি ইহার পূর্বে গভর্ণর জেনারেলের পরিষদে হেষ্টিংসের শত্রুদলের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস চৈৎ সিংহকে সাজা দিবার জন্য সসৈন্যে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিলেন। এই ব্যাপারে স্থানীয় লোকেরা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, এবং যে হাঙ্গামার সৃষ্টি হইল তাহার ফলে ইংরাজ দলের বহু সৈনিক নিহত হইল। হেষ্টিংস চুনারে পলাইয়া গেলেন। কিছুকাল পরে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হেষ্টিংস চৈৎ সিংহকে আক্রমণ করিলেন। চৈৎ সিংহ পরাজিত হইয়া মারাঠাদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হেষ্টিংস চৈৎ সিংহের এক আত্মীয়কে রাজপদে মনোনীত করিলেন। ব্যবস্থা হইল যে নূতন রাজা কোম্পানীকে বার্ষিক চল্লিশ লক্ষ টাকা দিবেন। স্বাধীন রাজার যে সকল ক্ষমতা থাকে, সেই সকল ক্ষমতা

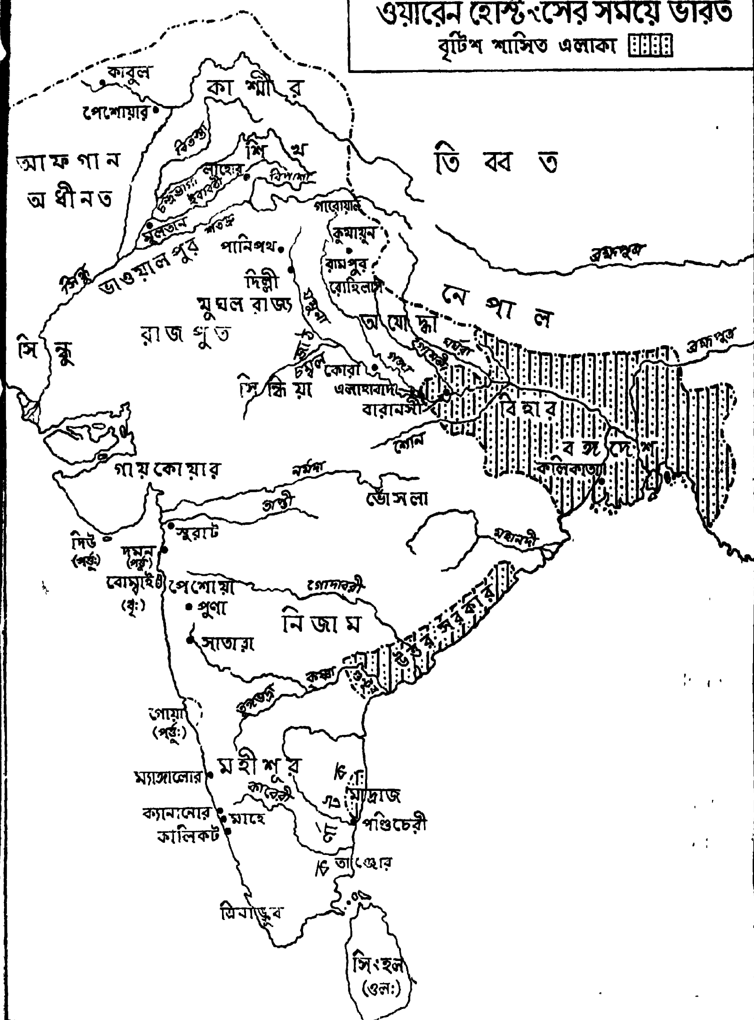
হইতে তিনি বঞ্চিত হইলেন। বারাণসীর রাজা জমিদারের পর্যায় নামিয়া গেলেন।

অযোধ্যার বেগমদের উপর অত্যাচার

বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে অযোধ্যা প্রদেশ রক্ষা করিবার জন্য কোম্পানী একদল সৈন্য অযোধ্যার নবাবের নিকট ভাড়া দেন। নবাব আসফ্‌উদ্দৌলা বিলাসব্যসনে দিন কাটাইতেন এবং তাঁহার ব্যয় এত অধিক ছিল যে তিনি কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা দিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে যখন হেষ্টিংস অর্থ সংগ্রহে হিতাহিতজ্ঞান লুপ্ত তখন নবাবের দেয় বহু টাকা বাকী পড়িয়াছিল। হেষ্টিংস সেই টাকা দাবী করাতে নবাব বলিলেন যে তাঁহার পৈতৃক অর্থ তাঁহার মাতা ও পিতামহীর নিকট গচ্ছিত আছে এবং তাহা পাইলে তিনি ঋণশোধ দিতে পারেন। হেষ্টিংস নবাবকে এই অর্থ আদায় করিতে অনুমতি দিলেন, কিন্তু নবাব গুরুজনদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সাহস করিলেন না। তখন হেষ্টিংসের আজ্ঞায় একদল কোম্পানীর সেন্য ফৈজাবাদে বেগমদের প্রাসাদ দখল করিল এবং বেগমরা তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থ কেম্পানীকে দিতে বাধ্য হইলেন।

হেষ্টিংসের বিচার

যাঁহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য হেষ্টিংস এইরূপ অন্যায় করিয়াছিলেন তাঁহারাও তাঁহার কার্য সমর্থন করিলেন না। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার শত্রুরা মিলিত হইয়া তাঁহাকে পার্লামেণ্টের সম্মুখে অন্যায়ভাবে রোহিলা যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, নন্দকুমারের ফাঁসির ব্যাপারে জড়িত থাকা, চৈৎ সিংহ ও অযোধ্যার বেগমদের উপর অত্যাচার করা ইত্যাদি নানা দফায় অভিযুক্ত করিল। সাত বৎসর ব্যাপী বিচারের পর হেষ্টিংস মুক্তি পাইলেন। বার্ক, ফক্স প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে ছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ৮৫ বৎসর বয়সে হেষ্টিংস পরলোকগমন করেন।


ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে ভারত
বৃটিশ শাসিত এলাকা
কাবুল
পেশোয়ার
কাশ্মীর
আফগান অধীনত
শিখ
লাহোর
মুলতান
ভাওয়ালপুর
পানিপথ
দিল্লী
গারোয়াল
কুমায়ুন
রামপুর
রোহিলখণ্ড
তিব্বত
নেপাল
মুঘল রাজ্য
রাজপুত
সিন্ধু
অযোদ্ধা
বিহার
বঙ্গদেশ
কলিকাতা
সিন্ধিয়া
কোরা
এলাহাবাদ
বারানসী
শোন
গায়কোয়ার
নর্মদা
ভোঁসলা
তাপ্তী
মহানদী
সুরাট
দিউ (পর্তু:)
দমন (পর্তু:)
বোম্বাই (বৃ:)
পেশোয়া
গোদাবরী
পুণা
নিজাম
সাতারা
উত্তর সরকার
কৃষ্ণা
তুঙ্গভদ্রা
গোয়া (পর্তু:)
মহীশূর
ম্যাঙ্গালোর
কাবেরী
মাদ্রাজ
ক্যানানোর
মাহে
কালিকট
পণ্ডিচেরী
তাঞ্জোর
ত্রিবাঙ্কুর
সিংহল (ওল:)
ব্রহ্মপুত্র
চম্বল
যমুনা
গঙ্গা

হেষ্টিংসের কৃতিত্ব

ওয়ারেন হেষ্টিংস একজণ অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনে প্রধান অংশগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের স্থান অতুলনীয়। কোম্পানীর কাগজপত্রের মধ্যে রক্ষিত হেষ্টিংসের লিখিত পত্রাদি পাঠ করিলে তাঁহার মনের প্রসারতা সম্বন্ধে কোনও রূপ সন্দেহ থাকে না। তাঁহার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা ছিল অসীম। তাঁহার সাহস, সহ্যশক্তি ও মানসিক দৃঢ়তা ছিল প্রবল। তিনি কি ভাবে বাংলায় কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থা গঠন করেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। তিনি বলেন যে ভারতীয়দের নিজেদের আইন ও রীতি অনুযায়ী শাসন করা উচিত। ভারতীয় সংস্কৃতির উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার উৎসাহে হ্যাল্‌হেড্‌ হিন্দুদের আইন সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। এই দেশের ভাষা, সাহিত্য ও ভূগোল সম্বন্ধে অনুসন্ধানে কোম্পানীর যে সকল কর্মচারী উৎসাহী হন হেষ্টিংস তাঁহাদের মধ্যে প্রথম। স্যার উইলিয়ম জোন্‌সকে তিনি কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্‌ বেঙ্গল স্থাপনে সহায়তা করেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বন্ধু মেজর রেনেল তাঁহার প্রসিদ্ধ Bengal Atlas প্রকাশ করেন। ঐ বৎসর ওয়ারেণ হেষ্টিংস মুসলমানদের শিক্ষার জন্য কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তিনি তিব্বতে দুইবার দূত প্রেরণ করেন। কোম্পানীর সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপনই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তথাপি হেষ্টিংস তিব্বতের সংস্কৃতি ও উদ্ভিদাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে বলেন। হেষ্টিংসের উৎসাহে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ এবং গীতার ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার

ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা ভারতীয় ব্যাপারে কি ভাবে হস্তক্ষেপ করে তাহা নিয়ামক আইন আলোচনার সময়ে আমরা দেখিযাছি। নিয়ামক আইন কয়েক বৎসর কার্য্যকরী থাকার ফলে উহার দোষ-ত্রুটি স্পষ্টভাবে বোঝা গেল এবং দোষ-ত্রুটিগুলি সংশোধনের জন্য কয়েকটি আইন বিধিবদ্ধ করা হইল। এই নূতন আইন সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করিল এবং তাঁহার পরিষদের উপর গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিল।

পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট (১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ)

ইংলণ্ডে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শত্রুরা তাঁহার কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করিতেছিল। ওদিকে মারাঠাদের ও মহীশূরের সহিত যুদ্ধের ফলে কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে এবং কোম্পানী ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার নিকট অর্থ সাহায্য ভিক্ষা করে। সরকারী সাহায্য দিতে হইলে প্রথমে কোম্পানীকে সংশোধন করা আবশ্যক এইরূপ জনমত দেখা দিল। এই অবস্থায় ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী উইলিয়ম পিট্ ভারতের শাসন কার্য নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য এক নূতন আইন প্রবর্তন করিলেন (১৭৮৪ খৃঃ)। এই আইনের ফলে ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার কোম্পানীর কার্যকলাপের উপর ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাইল। ভারতীয় ব্যাপারে ইংলণ্ডের রাজার ও কোম্পানীর দ্বৈতশাসন স্থাপিত হইল।

পিটের ভারত আইন অনুযায়ী একটি Board of Control বা নিয়ন্ত্রণ সমিতি স্থাপিত হইল। ছয় জন সদস্য লইয়া এই সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির উপর ভারত শাসনের পর্যবেক্ষণভার ন্যস্ত হইল। বৃটিশ মন্ত্রিসভার একজন সদস্য এই সমিতির সভাপতি হ'ন। কোম্পানীর ২৪ জন পরিচালকদের মধ্যে তিনজনকে লইয়া একটি গোপন সমিতি (Secret Comittee) স্থাপিত হইল। এই গোপন সমিতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ সমিতির আজ্ঞা ভারতে প্রেরণ করা হইত। অপর ২১ জন পরিচালকদের কোনও রাজনৈতিক

ক্ষমতা রহিল না। অংশীদারদের সভারও (Court of Proprietors) নিয়ন্ত্রণ সমিতির সিদ্ধান্তের উপর কোনও ক্ষমতা থাকিল না। তিন জন সদস্য লইয়া গভর্ণর জেনারেলের পরিষদ গঠিত হইল। এই তিন জনের মধ্যে প্রধান সেনাপতি একজন। গভর্ণর জেনারেল ও তাঁহার পরিষদের মধ্যে মতভেদ হইলে গভর্ণর জেনারেলের অতিরিক্ত ভোটের সাহায্যে সমস্যার মীমাংসা করিবার ব্যবস্থা হইল। সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের বোম্বাই ও মাদ্রাজের উপর ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইল। যুদ্ধ, শান্তি ও দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত সম্পর্কে বোম্বাই ও মাদ্রাজ সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের সম্পূর্ণ অধীনস্থ হইল। কোম্পানীর পরিচালক সভার গোপন সমিতির অনুমতি বিনা গভর্ণর জেনারেল ও তাঁহার পরিষদ ভারতীয় রাজন্যবর্গের সহিত কোনও যুদ্ধে লিপ্ত হইতে পারিবে না, এইরূপ ব্যবস্থা হইল। স্পষ্টভাবে বলা হইল যে ভারতে সাম্রাজ্যবৃদ্ধি বৃটিশ জাতির অভিমত নহে।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিয়োগ

হেষ্টিংসের পদত্যাগের পর স্যার জন ম্যাক্‌ফার্সন্ কয়েকদিনের জন্য অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল হন। কোম্পানীর কর্মচারীদের উপর আস্থা না থাকাতে ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভা তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও গভর্ণর জেনারেলের পদে মনোনীত করিল না। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়া ভারতে আগমন করিলেন। তিনি ইংলণ্ডের এক অভিজাত বংশের সন্তান ছিলেন এবং সৎব্যক্তি বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি একজন সৈন্যাধক্ষ ছিলেন। সামরিক



লর্ড কর্ণওয়ালিস্

ব্যাপারে অভিজ্ঞতা থাকার জন্য তাঁহাকে ভারতে প্রধান সেনাপতির পদও দেওয়া হয়।

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

ভারতীয় নৃপতিদের সহিত কোনও যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়ার আজ্ঞা সত্ত্বেও কর্ণওয়ালিস মহীশূরের সুলতানের সহিত যুদ্ধ করেন।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিস নিজামের নিকট হইতে গুণ্টুর প্রদেশ আদায় করেন। তখন নিজাম ও মারাঠারা মহীশূরের অধিপতি টিপুকেই প্রধান শত্রু বলিয়া গণ্য করিতেন। পূর্বের এক সন্ধির সর্ত অনুযায়ী নিজাম কর্ণওয়ালিসের নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। নূতন ভারত আইনের বাধা থাকাতে কর্ণওয়ালিসের পক্ষে সাহায্য প্রেরণ করা সম্ভব হইল না। তিনি নিজামকে পত্র দিলেন যে ভবিষ্যতে বালাঘাট অঞ্চল ইংরাজদের অধিকারে আসিলে তিনি নিজাম ও মারাঠাদের সাহায্য করিবেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্য ইংরাজদের কোনও মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে, বিশেষতঃ মারাঠাদের বিরুদ্ধে, ব্যবহার করা চলিবে না। মিত্রশক্তিদের মধ্যে টিপুর নাম তিনি উল্লেখ করিলেন না। টিপু স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে ইংরাজরা নিজাম ও মারাঠাদের সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে উদ্যত ও সুবিধা পাইলেই তাঁহাকে আক্রমণ করিবে।

আক্রমণ করিবার কারণ টিপু নিজেই ইংরাজদের যোগাইয়া দিলেন। তিনি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। টিপু ইংরাজদের এক মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন এই অজুহাতে কর্ণওয়ালিস টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং নিজাম ও মারাঠাদের সহিত এক নূতন সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে কর্ণওয়ালিস স্বয়ং ইংরাজ সৈন্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে টিপু পরাজিত হইয়া শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধিতে রাজী হ'ন। এই সন্ধি অনুযায়ী টিপু তাঁহার রাজ্যের অর্ধেক ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হ'ন। ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাঁহাকে ৩৩০ লক্ষ টাকা দিতে হয় ও তাঁহার দুই পুত্রকে ইংরাজরা জামিন হিসাবে কলিকাতায় লইয়া আসে।

টিপুর হস্তচ্যুত রাজ্যাংশ ইংরাজ, নিজাম ও মারাঠারা ভাগ করিয়া লয়। ইংরাজরা মালাবার, কুর্গ, ডিন্তিগুল ও বরমহল প্রাপ্ত হয়।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে পিটের ভারত আইন লঙ্ঘন করা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা কর্ণওয়ালিসের কার্য সমর্থন করে এবং তাঁহাকে নূতন সম্মানে ভূষিত করে।

মহীশূর ব্যতীত অন্যান্য ভারতীয় নৃপতিদের সহিত কর্ণওয়ালিস্ মৈত্রী রক্ষা করেন এবং তাঁহাদের পরস্পরের ঝগড়া বিবাদে নিরপেক্ষ থাকেন। মাহাদজী সিন্ধিয়া অযোধ্যার উপর দৃষ্টিপাত করাতে কর্ণওয়ালিস্ তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেন।

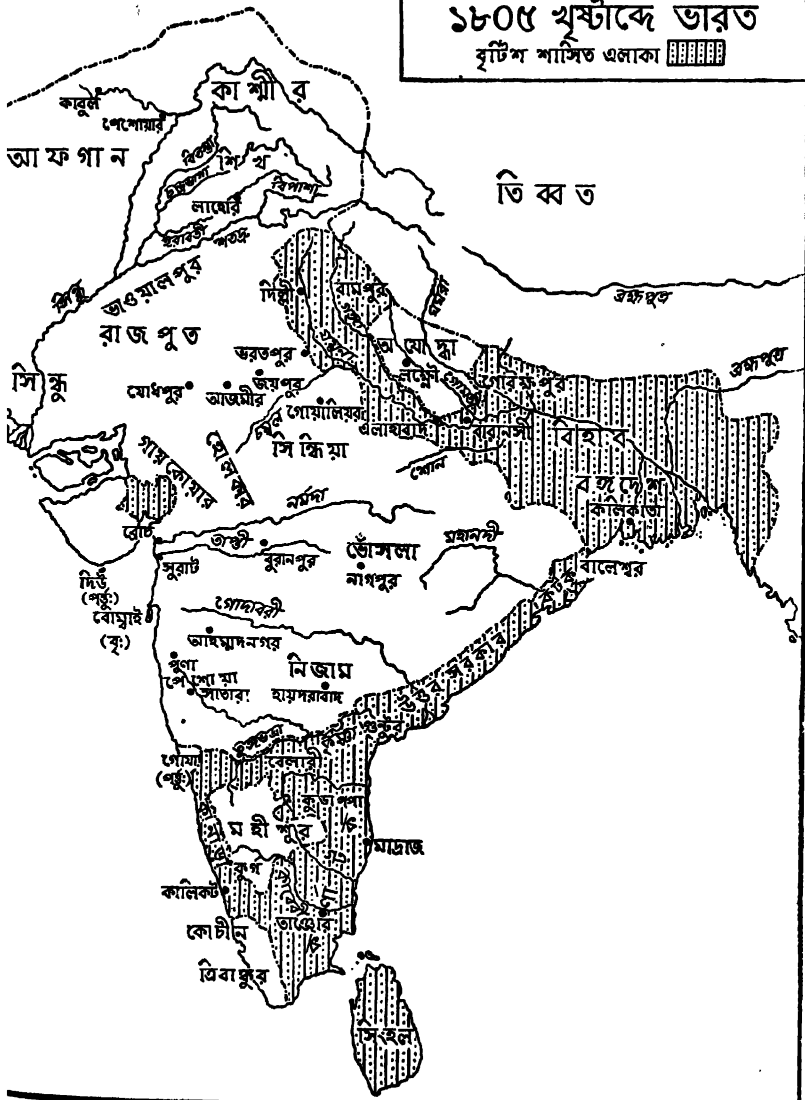
স্যার জন্ শোর (১৭৯৩-১৭৯৮)

কর্ণওয়ালিসের পর স্যার জন্ শোর ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনি যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষতা নীতি অনুসরণ করেন। ইংরাজরা নিজামকে বিপদকালে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে যখন পেশোয়ার প্রধানমন্ত্রী নানা ফড়নবীশের নেতৃত্বে মারাঠা সামন্তরা একত্রিত হইয়া নিজামকে খর্দার যুদ্ধে পরাস্ত করিল তখন শোর নিজামকে কোন সাহায্য প্রেরণ করিলেন না। ফলে নিজাম অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলেন এবং মারাঠাদের শক্তি বৃদ্ধি পাইল।

মারাঠাদের মধ্যে পুনরায় গৃহবিবাদের সূচনা না হইলে তাহাদের সহিত ভবিষ্যত যুদ্ধে ইংরাজরা অত্যন্ত বিপন্ন হইত ইহার সন্দেহ নাই। পেশোয়া মাধব রাও নারায়ণ আত্মহত্যা করিলেন। এই ঘটনার পর মারাঠাদের মধ্যে নানা গোলযোগ উপস্থিত হইল। অবশেষে দ্বিতীয় বাজীরাও পেশোয়া হইলেন, কিন্তু সকল মারাঠা সামন্ত তাঁহার কর্তৃত্ব মানিল না এবং মারাঠাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ চলিতে লাগিল্। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নানা ফড়নবীশের মৃত্যু হইলে পর মারাঠাদের মধ্যে কোনও কেন্দ্রীয় শক্তি রহিল না।

লর্ড ওয়েলেস্লী (১৭৯৮-১৮০৫)

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্লী গভর্ণর জেনারেল পদ প্রাপ্ত হইয়া ভারতে আসিলেন। তখন ইউরোপে ইংরাজদের সহিত ফরাসীদের যুদ্ধ চলিতেছিল।


১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ভারত
বৃটিশ শাসিত এলাকা
কাশ্মীর
কাবুল
পেশোয়ার
আফগান
শিখ
বিপাশা
লাহোর
শতদ্রু
তিব্বত
ভাওয়ালপুর
রাজপুত
দিল্লী
রামপুর
ভরতপুর
অযোদ্ধা
জয়পুর
সিন্ধু
যোধপুর
আজমীর
লক্ষ্ণৌ
গোরক্ষপুর
গোয়ালিয়র
এলাহাবাদ
বারানসী
বিহার
সিন্ধিয়া
শোন
ব্রহ্মপুত্র
বঙ্গদেশ
কালিকাতা
নর্মদা
ব্রোচ
তাপ্তী
বুরানপুর
ভোঁসলা
মহানদী
সুরাট
নাগপুর
বালেশ্বর
দিউ
(পর্তু:)
বোম্বাই
(বৃ:)
গোদাবরী
আহম্মদনগর
পুণা
নিজাম
পেশোয়া
সাতারা
হায়দরাবাদ
উত্তর সরকার
গুন্টুর
বেলারী
গোয়া
(পর্তু:)
কুড়াপা
মহীশুর
মাদ্রাজ
কালিকট
কোচীন
তাঞ্জোর
ত্রিবাঙ্কুর
সিংহল

ফরাসী সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্ট মিশরদেশ আক্রমণ করিয়া ভারত পর্যন্ত অগ্রসর হইবার কল্পনা করিতেছিলেন। নৌ সেনাপতি নেল্‌সনের অধীনে ইংরাজ নৌবহর ফরাসীদের পরাস্ত করিয়া তাহাদের অগ্রগতি রোধ করিল বটে, কিন্তু ইংরাজদের মনে ফরাসী ভীতি রহিয়া গেল। নিজাম, টিপু এবং মারাঠারা প্রত্যেকেই ফরাসীদের সাহায্যপ্রার্থী ছিলেন। ডি বয়েন্ নামক একজন ফরাসী সিন্ধিয়ার সৈন্যদলকে ইউরোপীয় রীতিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। নিজামও রেমণ্ড নামে অপর একজন ফরাসীকে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষিত একদল সৈন্য গঠন করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় লর্ড ওয়েলেস্‌লী নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করিলেন এবং ভারতীয় নৃপতিদের শক্তি খর্ব করিয়া ইংরাজদের একাধিপত্য স্থাপনের চেষ্টায় ব্রতী হইলেন।



লর্ড ওয়েলেস্‌লী

ভারতীয় শক্তিগুলি পরস্পরের সম্বন্ধে সর্বদা সন্দিগ্ধ থাকার জন্য ওয়েলেস্‌লীর সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করা সম্ভব হইল। দেশীয় রাজ্যগুলির শক্তি অপহরণ করিয়া ইংরাজদের উপর নির্ভরশীল করিবার জন্য তিনি ইহাদের ‘বশ্যতামূলক বন্ধুত্বে’ আবদ্ধ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা এইরূপ বন্ধুত্বে স্বীকৃত হইলেন ওয়েলেস্‌লী তাঁহাদের রাজ্য বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। এইরূপ ‘বন্ধুরা’ ইংরাজদের অনুমতি বিনা অপর কোনও রাজ্যের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ চালাইতে বা কূটনৈতিক সম্বন্ধ রাখিতে পারিবেন না, একদল ইংরাজ সৈন্য তাঁহাদের রাজ্যের সীমানার মধ্যে থাকিবে এবং এই সৈন্যদলের যাবতীয় ব্যয় তাঁহারা বহন করিবেন।

নিজাম সর্বপ্রথম ইংরাজদের সহিত এইরূপ সন্ধিতে স্বীকৃত হ’ন। মারাঠারা

নিজামের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। হায়দ্রাবাদ রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষাই দুরূহ হইয়াছিল। কাজেই নিজামকে এইরূপ সন্ধিতে আবদ্ধ করা ওয়েলেস্‌লীর পক্ষে সহজ হইল (১৮০০ খৃষ্টাব্দ)।

চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ

তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধে পরাজয়ের পর টিপু ইংরাজদের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এইজন্য তিনি ফ্রান্স ও তুরস্কের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। মরিশসের ফরাসী শাসনকর্তা যখন টিপুর সৈন্যদলে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান প্রচার করিলেন তখন টিপু যে ফরাসীদের সহিত গোপনে পত্র বিনিময় করিতেছিলেন তাহা প্রকাশ পাইল। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী ওয়েলেস্‌লী টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। বোম্বাই হইতে প্রেরিত এক ইংরাজ সৈন্যদল কুর্গের নিকট টিপুর এক সৈন্যদলকে পরাস্ত করিল। অপর একদল ইংরাজ সৈন্য টিপুকে মালাভেলীর যুদ্ধে পরাজিত করিয়া শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করিল। টিপু রাজধানীর দুর্গদ্বার রক্ষারত অবস্থায় নিহত হইলেন। ইংরাজ সৈন্য শ্রীরঙ্গপত্তন লুণ্ঠন করিল। টিপুর রাজ্যের কিয়দংশ ইংরাজরা নিজামের সহিত ভাগ করিয়া লইল। অবশিষ্ট অংশের রাজা হইলেন পঞ্চমবর্ষীয় এক হিন্দু রাজপুত্র। যে ওদেয়ার রাজবংশকে রাজ্যচ্যুত করিয়া হায়দার আলি মহীশূরের অধিপতি হইয়াছিলেন, এই শিশু সেই বংশের। এই নূতন মহীশূর রাজ্য বশ্যতামূলক বন্ধুত্বে আবদ্ধ হইল।

ভারতীয় ইতিহাসে টিপু এক স্মরণীয় ব্যক্তি। তাঁহার সমসাময়িক নৃপতিদের ন্যায় তিনি যদি অলস ও আরামপ্রিয় হইতেন তাহা হইলে তিনি ওয়েলেস্‌লীর 'বশ্যতামূলক বন্ধুত্ব' স্বীকার করিতেন। কিন্তু তিনি নির্ভীক ও স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন। মহীশূরের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার চেষ্টায় তিনি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়াছিলেন। তিনি প্রজাহিতৈষী ছিলেন এবং শাসনকার্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। তিনি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন, কিন্তু হিন্দু মন্দিরের জন্য অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। অনেকগুলি ভাষার উপর

তাঁহার দখল ছিল এবং তাঁহার গ্রন্থাগারের জন্য তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করেন।

ইংরাজ সৈন্যের খরচ চালাইতে না পারিয়া নিজাম অল্পকালের মধ্যেই ইংরাজদের নিকট ঋণী হইয়া পড়িলেন এবং মহীশূরের যে অংশ পাইয়াছিলেন ঋণের দায়ে তাহা ছাড়িয়া দিলেন। পুরাতন মহীশূর রাজ্যের অধিকাংশই ইংরাজদের করতলগত হইল।

তাঞ্জোর, সুরাট, কর্ণাটক ও অযোধ্যার অংশ অধিকার

তাঞ্জোর একটি ছোট মারাঠা রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের সিংহাসন লইয়া বিবাদ চলিতেছে দেখিয়া ওয়েলেস্‌লী তাঞ্জোরের রাজাকে ইংরাজদের বৃত্তিভোগী করিলেন। সুরাটের নবাবের মৃত্যু হওয়াতে সুরাটেরও তাঞ্জোরের ন্যায় অবস্থা হইল। টিপুর সহিত ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ওয়েলেস্‌লী কর্ণাটকের নবাবকে পদচ্যুত করিয়া কর্ণাটক অধিকার করিলেন। অযোধ্যার নবাবও তাঁহার রাজ্যের মধ্যে কোম্পানীর সৈন্যদল রাখিতে বাধ্য হইলেন এবং ইঁহাদের ব্যয় বাবদ গোরক্ষপুর ওরোহিলখণ্ড, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোআব প্রদেশ ইংরাজদের দান করিলেন।

পেশোয়ার বশ্যতা স্বীকার

নিজামের সহিত বশ্যতামূলক সন্ধির ফলে ইংরাজরা হায়দ্রাবাদ রাজ্য বহিঃশত্রুর হাত হইতে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। মহীশূর রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষা করার ভারও ইংরাজরা লইয়াছিল। এই অবস্থায় মারাঠাদের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকা অসম্ভব হইল। পররাজ্য আক্রমণ করিয়া চউথ্‌ আদায় না করিলে মারাঠারা সৈন্যবাহিনীর খরচ বহন করিতে পারিত না। সেইজন্য তাহারা প্রায়ই হায়দ্রাবাদ ও মহীশূর আক্রমণ করিত। কাজেই তাহাদের সংযত করা ওয়েলেস্‌লীর পক্ষে একান্তই আবশ্যক হইল। ওয়েলেস্‌লী পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওকে বশ্যতামূলক বন্ধুত্বে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। মারাঠাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় শক্তির অভাব ও গৃহবিবাদের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ইহার ফলে মারাঠাদের যে অবস্থা হয়

তাহাতে ওয়েলেস্‌লীর কৃতকার্য হওয়া সম্ভব হইল। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে যশোবন্ত রাও হোলকার, দৌলত রাও সিন্ধিয়া এবং পেশোয়ার সম্মিলিত সৈন্যদলকে পরাস্ত করিলেন। ইহার পর দ্বিতীয় বাজীরাও ভীত হইয়া ইংরাজদের সহিত বশ্যতামূলক বন্ধুত্বে স্বীকৃত হইলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে বেসিনে সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। ইংরাজ সেনাপতি আর্থার ওয়েলেস্‌লী (পরে ডিউক্ অফ্ ওয়েলিংটন্) পুনা দখল করিয়া বাজীরাওকে গদিতে বসাইলেন। পেশোয়া পদের জন্য হোলকার অমৃতরাওকে মনোনীত করিয়াছিলেন। এখন অমৃতরাও কাশীবাসী হইলেন। ইংরাজদের অনুগ্রহে পেশোয়ার গদিতে বাজীরাও সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন বটে, কিন্তু স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিলেন। তাঁহার রাজ্যের মধ্যে ইংরাজ সৈন্য রাখিতে এবং তাহাদের খরচ বাবদ বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হইলেন। ইংরাজদের অনুমতি বিনা কোনও রাজ্যের সহিত যুদ্ধ করিতে বা আলাপ আলোচনা করিতে পারিবেন না, বাজীরাও এই সর্তে স্বীকৃত হইলেন।

দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধ

পেশোয়া বশীভূত হইলেও মারাঠা সামন্তরা বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করিল না। কিন্তু এই বিপদকালেও তাহারা একত্র হইয়া ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারিল না। সিন্ধিয়া এবং বেরারের রাজা ভোঁসলা নিজামের রাজ্যের সীমানায় সৈন্য সমাবেশ করিলেন। হোলকার তাঁহাদের সহিত যোগ দিতে অসম্মত হইলেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দক্ষিণ ভারতে ইংরাজ সৈন্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন আর্থার ওয়েলেস্‌লী। নিজামের রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিকট আসাই নামক স্থানে মারাঠাদের সহিত ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং কোম্পানীর সৈন্যদল জয়ী হয়। ইহার পর আর্থার ওয়েলেস্‌লী আরগাঁওতে বেরারের সৈন্যকে পরাস্ত করিলেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ভোঁসলার সহিত দেওগাঁওতে সন্ধি হইল। ভোঁসলা বশ্যতামূলক বন্ধুত্ব স্বীকার করিলেন। উত্তর-ভারতে সেনাপতি লেক্ দিল্লীর যুদ্ধে ও লাসাওয়ারীতে সিন্ধিয়াকে পরাজিত করিলেন। সুর্জ্জিঅর্জ্জুনগাঁও নামক স্থানে সিন্ধিয়া ইংরাজদের সহিত সন্ধি

করিলেন। তিনি তাঁহার রাজ্যের এক অংশ ছাড়িয়া দিলেন এবং বশ্যতামূলক বন্ধুত্বে আবদ্ধ হইলেন। মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে ওয়েলেস্‌লী সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার শক্তি খর্ব করিলেন।

হোলকার, সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার সহিত যোগদান করেন নাই। এখন স্বাধীনতা বিপন্ন দেখিয়া তিনি যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ইংরাজরাও তিন দিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। হোলকার কর্ণেল মন্‌সনের অধীনে একদল সৈন্যকে রাজপুতানায় মুকুন্দ্রা গিরিপথে পরাস্ত করিলেন। তৎপরে ভরতপুরের রাজার সহিত মিলিত হইয়া তিনি দিল্লী আক্রমণ করিলেন। কিন্তু ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে দীগের যুদ্ধে হোলকারের সম্পূর্ণ পরাজয় হইল ও তিনি পাঞ্জাবে পলায়ন করিলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ (১৮০৫) ও স্যার জর্জ বার্লো (১৮০৫-১৮০৭)

বিলাতের কর্তৃপক্ষ ওয়েলেস্‌লীর অগ্রসর নীতি ভীতির চক্ষে দেখিতেছিলেন। হোলকারের সহিত পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ ও কর্ণেল মন্‌সনের পরাজয়ের সংবাদে তাঁহারা ওয়েলেস্‌লীকে দেশে ফিরিয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন ও পুনরায় লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌কে গর্ভনর জেনারেল নিযুক্ত করিয়া ভারতে পাঠাইলেন। কর্ণওয়ালিসের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। অল্পকালের মধ্যেই গাজিপুরে তাঁহার মৃত্যু হইল। বড়লাটের মন্ত্রণাসভার সদস্য স্যার জর্জ বার্লো অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। তিনি কর্তৃপক্ষের নিরপেক্ষ নীতি পূর্ণভাবে কার্যকরী করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি যসবন্তরাও হোলকারকে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন ও রাজপুতানার রাজন্যবর্গকে মারাঠাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে স্বীকৃত হইলেন না। বুন্দীর রাজা কর্ণেল মন্‌সন্‌কে বিপদের সময় সাহায্য করিয়াছিলেন। মারাঠারা তাঁহাকে আক্রমণ করিল, কিন্তু বার্লো কোনও সাহায্য করিলেন না।

লর্ড মিণ্টো (১৮০৭-১৮১৩)

বার্লো অস্থায়ী বড়লাট ছিলেন। লর্ড মিণ্টো স্থায়ী গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়া ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ভারতে আসিলেন। এই সময়

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের শক্তির সম্মুখে সমগ্র ইউরোপ কম্পিত এবং ইংলণ্ড নেপোলিয়নের সহিত ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ফরাসীরা ইউরোপে জয়ী হইলেও পৃথিবীর পূর্বাঞ্চল হইতে লর্ড মিণ্টো তাহাদের বিতাড়িত করিলেন। লর্ড মিণ্টো ফরাসী অধিকৃত মরিশস্ প্রভৃতি দ্বীপ দখল করিলেন এবং ফরাসী নৌবহরকে ভারত মহাসাগর হইতে অপসারিত করিলেন। নেপোলিয়ন হল্যাণ্ড দখল করিয়াছিলেন। কাজেই ওলন্দাজদের অধিকৃত যবদ্বীপও ফরাসীদের হস্তগত হয়। লর্ড মিণ্টোর অধীনে ইংরাজ সৈন্য যবদ্বীপ দখল করিল। নেপোলিয়ন এশিয়ার রাজন্যবর্গকে ইংরাজদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। লর্ড মিণ্টো ম্যাল্‌কম্‌কে তাঁহার দূত হিসাবে পারস্যে প্রেরণ করেন এবং এলফিন্‌ষ্টোনকে আফগানিস্থানে পাঠান।


লর্ড মিণ্টো

ভারতে লর্ড মিণ্টো নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করিতে চেষ্টা করেন। কোনও কোনও ব্যাপারে তাঁহাকে এই নীতি ত্যাগ করিতে হয়।

রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি

শিখদের নেতা রণজিৎ সিংহ ভিন্ন ভিন্ন শিখদলগুলি নিজের অধীনে আনেন এবং শতদ্রু নদীর পশ্চিমে অবস্থিত অঞ্চলের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। শতদ্রু নদীর পূর্বদিকে কতকগুলি ক্ষুদ্র শিখ রাজ্য ছিল। তাহারা পরস্পরের সহিত সর্বদাই কলহ করিত। ইহাদের মধ্যে একজনের আমন্ত্রণে রণজিৎ সিংহ শতদ্রু পার হইয়া লুধিয়ানা দখল করিলেন (১৮০৬ খৃঃ)। রণজিৎ সিংহের নিকট স্বাধীনতা হারাইবার ভয়ে এই শিখ রাজারা লর্ড মিণ্টোর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। লর্ড মিণ্টো চার্লস মেটকাফ্‌কে রণজিৎ সিংহের দরবারে প্রেরণ করিলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল অমৃতসরে

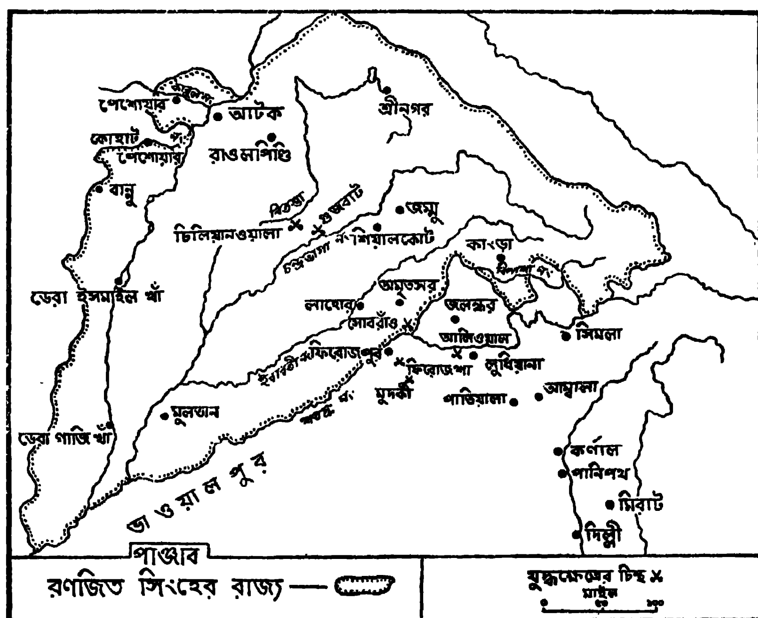
মেটকাফের সহিত রণজিৎ সিংহ এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে স্থির হইল যে শতদ্রু নদীর উত্তর-পশ্চিমে রণজিৎ সিংহের রাজ্যে ইংরাজরা হস্তক্ষেপ করিবে না এবং রণজিৎ সিংহ শতদ্রু নদীর বামতটে অবস্থিত শিখরাজ্যগুলির স্বাধীনতা নষ্ট করিবেন না। বলা বাহুল্য এই শিখরাজ্যগুলি ইংরাজদের অধীনস্থ হইল। এযাবৎ যমুনা নদী বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চলের সীমানা ছিল। এখন শতদ্রু নদী বৃটিশ সাম্রাজ্যের উত্তর পশ্চিম সীমানা বলিয়া পরিগণিত হইল। রণজিৎ সিংহ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন ইংরাজদের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন।


রণজিৎ সিংহ

লর্ড মিণ্টো অজয়গড় ও কালঞ্জর দুর্গ অধিকার করিয়া বুন্দেলখণ্ডে ইংরাজদের প্রভাব স্থাপন করেন। মারাঠারা মধ্যভারত ও রাজপুতানায় অত্যাচার করিতেছিল। কিন্তু মিণ্টো ভারতের বাহিরে ফরাসীদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাতে মারাঠাদের সহিত ব্যাপক যুদ্ধে লিপ্ত হইতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ফলে এই সকল অঞ্চলে অরাজকতা চলিতে থাকে।

লর্ড ময়রা (হেষ্টিংস্) (১৮১৩-১৮২৩)

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড ময়রা ভারতের গর্ভনর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। নেপাল যুদ্ধে কৃতিত্বের জন্য তাঁহাকে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে মার্কুউস্ অফ্ হেষ্টিংস্ উপাধি দেওয়া হয়। অতএব ভারতের ইতিহাসে লর্ড হেষ্টিংস্ নামে তিনি সমধিক পরিচিত।



(এই মানচিত্রে রণজিত সিংহের রাজ্য এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের রণক্ষেত্রগুলি প্রদর্শিত হইল)

গুর্খা যুদ্ধ

গুর্খা নামে এক পার্বত্য জাতি নেপালের পুরাতন রাজবংশকে উচ্ছেদ করিয়া পশ্চিমে শতদ্রু হইতে পূর্বে ভুটানের সীমান্ত পর্যন্ত এক বিরাট রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলও তাহাদের অধিকারে ছিল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে ইংরাজরা গোরক্ষপুর লাভ করাতে কোম্পানীর রাজ্যের উত্তর সীমা নেপালের দক্ষিণ সীমার সংলগ্ন হয়। গুর্খারা প্রায়ই সীমানা লঙ্ঘন করিয়া বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চলে হানা দিত। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তাহারা বুটওয়াল অঞ্চল আক্রমণ করিলে লর্ড হেষ্টিংস যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধে ইংরাজরা প্রথমে সুবিধা করিতে পারে নাই। পরে সেনাপতি স্যার ডেভিড্ অক্‌টারলোনী প্রায় কাটমুণ্ডু পর্যন্ত অগ্রসর হওয়াতে নেপালীদের সহিত সগৌলী নামক স্থানে সন্ধি হয় (১৮১৬ খৃঃ)। এই সন্ধির ফলে ইংরাজরা গহড়ওয়াল ও কুমায়ুন অঞ্চল এবং তরাই-এর অধিকাংশ লাভ করে; নেপালীরা সিকিম ছাড়িয়া দেয় এবং কাঠমুণ্ডুতে একজন ইংরাজ প্রতিনিধি রাখিতে বাধ্য হয়।

পিণ্ডারী দমন

তৎকালীন ভারতে অরাজকতার সুবিধা লইয়া নানারূপ দস্যুদল লুঠতরাজ করিয়া বেড়াইত। মধ্যভারতে পিণ্ডারী নামে দস্যুদল সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত। নানা জাতির হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বী পুরুষ ও নারী লইয়া এই দল গঠিত ছিল। এই দলের সর্দ্দারগণের মধ্যে করিম খাঁ, ওয়াসিল মহম্মদ ও চিতু সর্বজন পরিচিত ছিল। অধিকাংশ পিণ্ডারী দলই মারাঠা সামন্তদের আশ্রিত ছিল এবং মারাঠা সৈন্যদলের সহিত লুণ্ঠন কার্যে সহায়তা করিত। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে পিণ্ডারীগণ মিরজাপুর ও দক্ষিণ বিহার অঞ্চলে হানা দেয়। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তাহারা উত্তর সরকার অঞ্চলে ভয়াবহ কাণ্ড করে। বার দিনের মধ্যে তাহারা ৩৪০টি গ্রাম ধ্বংস করে এবং অগণিত নরনারীর উপর নৃশংস অত্যাচার করিয়া তাহাদের প্রাণনাশ করে। এই ঘটনার

পর লর্ড হেষ্টিংস পিণ্ডারীদের উচ্ছেদ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কোম্পানীর সৈন্যদল চতুর্দিক হইতে তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিল এবং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের মধ্যে পিণ্ডারী দলগুলিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিল। ওয়াসিল মহম্মদ বন্দী হইয়া আত্মহত্যা করিল। চিতু পলায়ন করিয়া আসিড়গড়ের নিকট এক জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছিল। সেখানে সে ব্যাঘ্রের মুখে প্রাণ হারাইল। আমির খাঁ ও করিম খাঁকে জায়গীর দিয়া ভদ্র জীবন যাপনের সুযোগ দেওয়া হইল।

তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ

পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও বিপদে পড়িয়া বেসিনের সন্ধিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরেই তিনি স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবার আশায় ইংরাজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ইংরাজরা জানিতে পারিয়া পেশোয়াকে একটি নূতন সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিল। তাঁহাকে কোঙ্কন প্রদেশ ও কয়েকটি দুর্গ ছাড়িয়া দিতে হইল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে দ্বিতীয় বাজীরাও পুণার নিকট খরকী নামক স্থানে ইংরাজদের আক্রমণ করিলেন। পরাজিত হইয়া পেশোয়ার সৈন্য পলায়ন করিল এবং ইংরাজরা পুণা দখল করিল। পেশোয়ার সহিত ইংরাজদের পুনরায় অষ্টিতে যুদ্ধ হইল। ইংরাজরা জয়লাভ করিল এবং পেশোয়া ইংরাজদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। পেশোয়া পদ লোপ পাইল। ইংরাজরা বাজীরাওকে বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিতে প্রতিশ্রুত হইল এবং কানপুরের নিকট বিঠুর নামক স্থানে বাস করিবার অনুমতি দিল। পেশোয়ার রাজ্য বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইল (১৮১৮ খৃঃ)। কেবল, সাতারা ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ কিছু



লর্ড হেষ্টিংস্

স্থান লইয়া একটি ছোট রাজ্য গঠিত হইল এবং ইংরাজরা এই রাজ্য শিবাজীর বংশধর প্রতাপ সিংহকে দিল।

ভোঁসলা ও হোলকারও লুপ্ত স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবার আশায় ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সীতাবলদি ও নাগপুরের যুদ্ধে ভোঁসলার সৈন্য পরাস্ত হয়। আপ্পা সাহেব ভোঁসলা পাঞ্জাবে পলায়ন করেন। নর্ম্মদা নদীর উত্তরে অবস্থিত ভোঁসলা রাজ্যের অংশ বৃটিশ সম্রাজ্য-ভুক্ত হয়। নর্ম্মদার দক্ষিণের অংশ ইংরাজরা একজন নূতন রাজাকে দান করে।

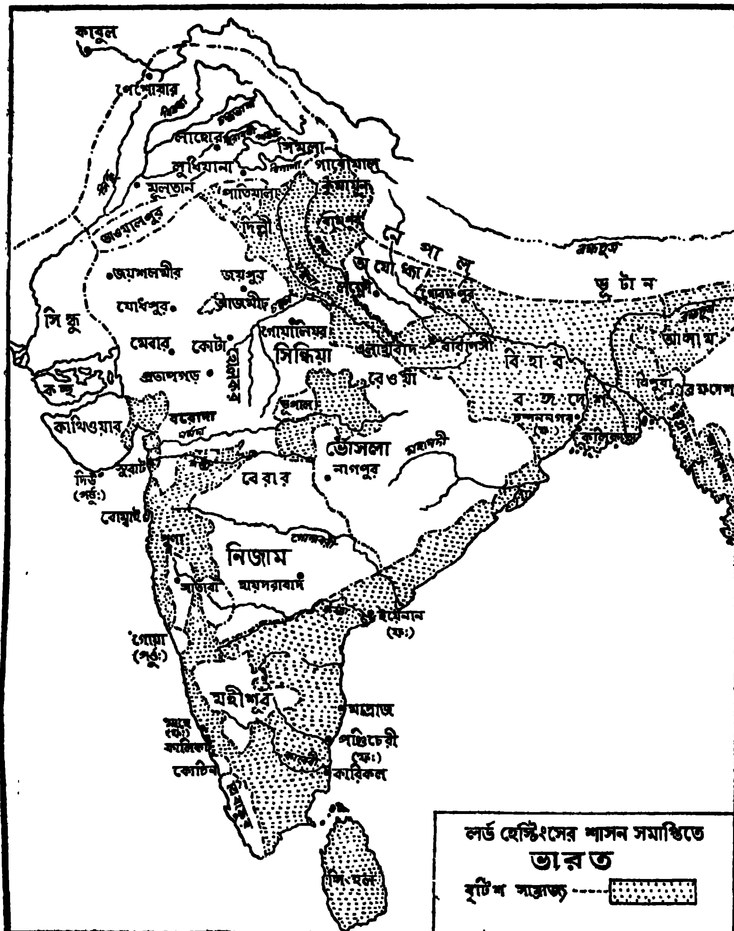
মহিদপুরের যুদ্ধে হোলকার পরাজিত হইয়া সন্ধি করেন। ইংরাজরা হোলকারের রাজ্যের অর্দ্ধেক অংশ কাড়িয়া লয়। সিন্ধিয়াকেও এক নূতন সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে হয়।

মারাঠাদের আক্রমণে ও পিণ্ডারীদের দৌরাত্মে মালব ও রাজপুতানার রাজ্যগুলি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। তাহারা সহজেই ইংরাজদের আশ্রয়ে আসিতে স্বীকৃত হইল। মেটকাফ্ ১৯টি রাজপুত রাজ্যের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। তাহারা ইংরাজদের অধীনে মিত্ররাজ্যে পরিণত হইল। জয়পুর উদয়পুর, যোধপুর ও বুন্দি তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সুপরিচিত।

কচ্ছ প্রদেশের রাণা ইংরাজদের সন্ধির জালে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বিদ্রোহী হওয়াতে একদল ইংরাজ সৈন্য কচ্ছের রাজধানী ভুজ দখল করে। রাণাকে সিংহাসনচ্যুত করা হয় এবং একজন শিশু রাজপুত্র তাঁহার স্থানে স্থাপিত হয়। একজন বৃটিশ প্রতিনিধির উপর কচ্ছ প্রদেশের শাসনভার ন্যস্ত হয়।

এই ভাবে লর্ড হেষ্টিংস মারাঠাদের সম্পূর্ণ শক্তিহীন করেন ও মধ্যভারতেও ইংরাজ প্রভুত্ব বিস্তার করেন। শতদ্রু নদীর তীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত সমগ্র ভারতে ইংরাজরা সার্বভৌম শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতের পশ্চিম উপকূলে জলদস্যুরা দীর্ঘকাল ধরিয়া উপদ্রব করিত। পেশোয়ার রাজ্য ইংরাজদের হস্তগত হওয়ার ফলে পশ্চিমঘাট ও আরব সাগরের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডের নিরাপত্তার ভার তাহাদের উপর পড়ে। বৃটিশ নৌবহর আরব-সাগর, পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগর হইতে জলদস্যুদের বিতাড়িত করে।


কাবুল
পেশোয়ার
লাহোর
সিমলা
লুধিয়ানা
মুলতান
পাতিয়ালা
দিল্লী
কুমায়ুন
নেপাল
অযোধ্যা
জয়শলমীর
জয়পুর
যোধপুর
আজমীড়
সিন্ধু
মেবার
কোটা
গোয়ালিয়র
সিন্ধিয়া
এলাহাবাদ
বারাণসী
বিহার
ভুটান
আসাম
প্রতাপগড়
বেওয়া
কচ্ছ
কাথিওয়ার
বরোদা
বঙ্গদেশ
চন্দননগর
(ফ:)
কলিকাতা
ত্রিপুরা
ভোঁসলা
নাগপুর
দিউ
(পর্তু:)
সুরাট
বেরার
বোম্বাই
নিজাম
সাতারা
হায়দরাবাদ
ইয়েনান
(ফ:)
গোয়া
(পর্তু:)
মহীশূর
মাদ্রাজ
কালিকট
পণ্ডিচেরী
(ফ:)
কোচিন
কারিকল
সিংহল
লর্ড হেস্টিংসের শাসন সমাপ্তিতে
ভারত
বৃটিশ সাম্রাজ্য

লর্ড মিণ্টো যবদ্বীপ অধিকার করিয়াছিলেন। নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ওলন্দাজরা স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইলে ইংরাজরা যবদ্বীপ ওলন্দাজদের প্রত্যর্পণ করে। ইহাতে চীন ও এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য দেশের সহিত ইংরাজদের বাণিজ্য সম্বন্ধ রক্ষার অসুবিধা হইতেছিল। এই অবস্থায় লর্ড হেষ্টিংস সিঙ্গাপুর দ্বীপটি দখল করিলেন। তখন সেখানে মাত্র কয়েকটি দরিদ্র মৎসজীবি বাস করিত। এখন সিঙ্গাপুর একটি সমৃদ্ধ সহর।

ভারতে ইংরাজ প্রাধান্য যতদূরই বিস্তৃত হউক না কেন, এ পর্যন্ত তাহারা দিল্লীর মোঘল বাদশাহকে ভারত সম্রাট বলিয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে গণ্য করিত ও প্রতি বৎসর তাঁহাকে নজর প্রদান করিত। লর্ড হেষ্টিংস এই নজর প্রদান বন্ধ করিয়া দিলেন, কিন্তু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানীর মুদ্রায় বাদশাহ শাহ আলমের নাম অঙ্কিত থাকিত।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংস পদত্যাগ করেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভারতে নবজাগরণ

কর্ণওয়ালিসের শাসন সংস্কার

কোম্পানীর শাসনের জন্য উন্নত ব্যবস্থা করা ও তাহাদের কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি দূর করার উদ্দেশ্যে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের কর্মচারীদের মধ্য হইতে কাহাকেও নির্বাচিত না করিয়া ইংলণ্ডের এক জমিদার বংশের সন্তান লর্ড কর্ণওয়ালিসকে বিশেষ ক্ষমতায় ভূষিত করিয়া গভর্ণর জেনারেল পদে নিযুক্ত করেন।

এই সময়ে কোম্পানীর কর্মচারীদের বেতন খুব সামান্য ছিল। তাহারা কোম্পানীর নিষেধ সত্বেও বেনামী ভাবে দেশের মধ্যে ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিত এবং নানা অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করিত। ইহা বন্ধ করিবার জন্য

কর্ণওয়ালিস তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিলেন। বারাণসীতে কোম্পানীর আবাসিক মাসিক ১০০০৲ টাকা বেতন পাইতেন। কিন্তু তাঁহার আয় ছিল বার্ষিক প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। কর্ণওয়ালিস তাঁহার বেতন মাসিক ৫০০০৲ টাকা নির্ধারিত করিলেন।

রাজস্ব আদায়ের জন্য ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রতি জেলায় একজন ইংরাজ কালেক্টর নিযুক্ত করেন। ইহারা রাজস্ব আদায় করিত ও দেওয়ানী মামলার বিচার করিত। কর্ণওয়ালিস এই দুই কার্য পৃথক কর্মচারীর হস্তে ন্যস্ত করিলেন। কালেক্টরগণের হাতে কেবল রাজস্ব আদায়ের ভার রহিল। দেওয়ানী বিচারের জন্য প্রত্যেক জিলাতে এক একজন ইউরোপীয় জজের অধীনে দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হইল। জিলা আদালত হইতে আপীল শুনিবার জন্য বিভাগীয় আদালত স্থাপিত হইল। সর্বোপরি রহিল কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালত। জিলার জজ্‌দের ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাও দেওয়া হইল। ২০ বর্গমাইল এলাকা লইয়া ভারতীয় দারোগার অধীনে এক একটি থানা প্রতিষ্ঠিত হইল। জিলার জজ্‌-ম্যাজিষ্ট্রেটরা দারোগাদের কার্য পরিচালনা করিবার ভার পাইলেন। বিভাগীয় আদালতের বিচারকদের জিলায় জিলায় ঘুরিয়া ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তি করার ভার দেওয়া হইল।

শাসন ব্যবস্থায় ইউরোপীয়দের প্রাধান্য

ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভারতীয়দের সাহায্যে শাসনকার্য্য পরিচালনা করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কর্ণওয়ালিস দেশীয় লোককে দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করার বিরোধী ছিলেন। তাঁহার সময় হইতেই আমাদের দেশের শাসন-ব্যবস্থায় ইউরোপীয় কর্মচারীদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। ইউরোপীয়রাই কালেক্টর ও জজ্‌ ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইত। ভারতীয়রা কেবলমাত্র নিম্নস্তরের কর্মচারী হইতে পারিতেন। এই নীতির ফলে ক্রমশঃ দেশে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। এ দেশে যথেষ্ট ইউরোপীয় না থাকাতে এবং ব্যয় সংকোচের উদ্দেশ্যে কর্ণওয়ালিস্‌ জেলার সংখ্যা কমাইয়া দেন। সুতরাং জেলাগুলির আয়তন আরও বৃদ্ধি পাইল এবং এক একজন জেলা জজের নিকট মামলার সংখ্যাও

তদনুরূপ অধিক হইল। ফলে বহু মামলা দীর্ঘকাল ধরিয়া অমীমাংসিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। এইরূপ অসুবিধা সত্ত্বেও কর্ণওয়ালিস ভারতীয়দের দায়িত্বপূর্ণ পদ দান করিতে অসম্মত ছিলেন। কর্ণওয়ালিসের আমলে উত্তরকালের সিভিল সার্ভিসের সূচনা হইয়াছিল বলা যাইতে পারে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

আমরা দেখিয়াছি যে ওয়ারেণ হেষ্টিংস যাহারা সর্বাপেক্ষা বেশী টাকা খাজনা দিতে স্বীকৃত হইল তাহাদের সহিত ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে জমির রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করেন। ইজারাদাররা লোভে পড়িয়া জমি হইতে ন্যায্যভাবে যাহা পাইতে পারা যায় তাহার অধিক খাজনা দিতে প্রতিশ্রুত হইল। তাহাদের মধ্যে অনেকে কৃষকদের উপর অত্যাচার করিয়াও তাহাদের দেয় খাজনার অনুরূপ রাজস্ব আদায় করিতে পারিল না এবং তাহাদের নিকট কোম্পানীর বহু টাকা বাকী পড়িয়া গেল। অতএব ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের পর কর্তৃপক্ষের আজ্ঞায় হেষ্টিংস ইজারাদারদের সহিত বার্ষিক বন্দোবস্ত করিতে লগিলেন। প্রতি বৎসর নূতন বন্দোবস্তের সময় খাজনার হার বৃদ্ধি পাইতেছিল। একাধারে কৃষকরা উৎপীড়িত হইতেছিল এবং বহু খাজনাও বাকী পড়িতেছিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে স্যার জন্ শোরের উপদেশে ইজারাদারদের সহিত দশ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করা হইল। ইহা দশশালা বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। শোরের মত উপেক্ষা করিয়া কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে বহু যুক্তি দেখাইয়া বিলাতে পত্র দিলেন। বোর্ড অফ-কন্ট্রোলের সভাপতি ডাণ্ডাস ও ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী পিট্ কর্ণওয়ালিসের মত সমর্থন করিলেন। রাজস্বের হার নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া ইজারাদারদের সহিত চিরকালের জন্য বন্দোবস্ত করাই স্থির হইল এবং ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হইল। স্থির হইল যে, ইজারাদাররা যতদিন নির্দিষ্ট রাজস্ব দিবেন ততদিন জমির সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী থাকিবেন। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে রাজস্ব দিতে না পারিলেই সূর্যাস্তের সঙ্গে তাঁহাদের জমিদারী ক্রোক করা হইবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল ঃ দেশের মূলধন ভূমিতে প্রয়োগ

ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। প্রতিবৎসর বা কয়েক বৎসর পরপরই ভূমি রাজস্ব নিলাম করার ব্যবস্থা কোম্পানীর দিক দিয়া এবং দেশের দিক দিয়া ক্ষতিকর ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা কোম্পানী একটি নির্দিষ্ট অঙ্ক ভূমি রাজস্ব হিসাবে পাইবার ব্যবস্থা করিল। ইজারাদারদের ভূমির স্বত্বাধিকারীতে পরিণত করিয়া কোম্পানার অনুগত এক জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি করাও ইংরাজদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিতে না পারিয়া এবং কোম্পানীর নির্দ্ধারিত খাজনা না দিতে পারিয়া বহু জমিদারী ক্রোক হইল। পাঁচশালা, দশশালা এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বহু পুরাতন অভিজাত বংশের লোকরা জমি নিলামে ডাকিয়া লইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে সূর্যাস্ত আইনের ফলে জমিদারী হারাইল। ব্যবসা-বাণিজ্যে সঞ্চিত অর্থের সাহায্যে এক নূতন শ্রেণীর লোক এই সকল জমিদারী ক্রয় করিল এবং অনেক পুরাতন অভিজাত বংশ সামান্য দরিদ্র অবস্থায় দিন কাটাইতে লাগিল। এই সময়ে বহু ব্যবসায়ী ব্যবসা-বাণিজ্য-ত্যাগ করিয়া জমিদার হইয়া বসে। এই শ্রেণীর মধ্যে অবাঙ্গালী অনেক ছিল। কালক্রমে শান্তি ও শৃঙ্খলায় ফলে দেশ অধিকতর সমৃদ্ধ হওয়াতে যে সকল পুরাতন জমিদাররা টিকিয়া ছিল, তাহারা এবং নূতন জমিদাররা লাভবান হইল। তাহারা বেশী হারে কৃষকদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিতে পারিল, কিন্তু কোম্পানাকে তাহাদের লাভের অংশ দিতে হইল না। কোনও কোনও জমিদার তাহাদের বাড়তি লাভের অংশ জনহিতকর কার্যে ব্যয় করিত। আবার কেহ কেহ প্রজাদের উপর অত্যাচার করিয়া অত্যধিক খাজনা আদায় করিত এবং সেই অর্থ বিলাসব্যসনে ব্যয় করিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় প্রজাদের স্বার্থরক্ষার জন্য কোনও নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় নাই। বহুকাল পরে কয়েকটি আইনের দ্বারা জমিদারদের উৎপীড়ন হইতে প্রজাদের রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে যখন নিয়ামক আইন বিধিবদ্ধ হয় তখন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দের মেয়াদ আরও কুড়ি বৎসরের জন্য বাড়াইয়া দেওয়া হয়। এই কুড়ি বৎসর পূর্ণ হইবার সময়ে সময়ে ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীরা কোম্পানীর ভারতে বাণিজ্য করিবার একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে। লর্ড কর্ণওয়ালিসের চেষ্টায় ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর ভারতে একচেটিয়া ব্যবসায় করিবার আবিষ্কার আরও ২০ বৎসরের জন্য দেওয়া হয়। অন্যান্য বণিকদের মাত্র ৩০০০ টন মাল পাঠাইবার অধিকার দেওয়া হয় এবং তাহাও এত প্রকার সর্ত্তে যে তাহাদের পক্ষে এই অধিকারের কোন মূল্যই রহিল না। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর সনন্দের মেয়াদ যখন শেষ হইল তখন কোম্পানীর ভারতে ব্যবসা করিবার একচেটিয়া অধিকার রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। সে সময়ে নেপোলিয়ন ইউরোপের কোনও বন্দরে বৃটিশ সামগ্রী প্রবেশ নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে ইংলণ্ডে এক অর্থনৈতিক সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল। এই অবস্থায় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতে তথা প্রাচ্য জগতে ব্যবসায় করিবার একচেটিয়া অধিকার রক্ষা করা অসম্ভব হইল। সকল বৃটিশ বণিককেই ভারতে ব্যবসা করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। . কোম্পানীকে কেবলমাত্র চীন দেশে আরও কুড়ি বৎসরের জন্য একচেটিয়া ব্যবসা করিবার অধিকার দেওয়া হইল।

কোম্পানী খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকদের ভারতে আসিবার অনুমতি দিতে অনিচ্ছুক ছিল। এখন বিশেষ অনুমতি পত্র লইয়া তাহাদের ভারতে আসিবার সুযোগ দেওয়া হইল। ভারতে অবস্থিত ইউরোপীয়দের ক্রিয়া-কর্মের জন্য এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে কলিকাতায় একজন বিশপ্ বা প্রধান ধর্মযাজক এবং তিনজন অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর যাজক নিযুক্ত হইল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দে ভারতীয়দের শিক্ষার উন্নতির জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইল। বৃটিশ আমলে শিক্ষার জন্য ভারত গভর্নমেণ্টের এই প্রথম দান।

অবাধ বাণিজ্যের ফলে ভারতে অর্থনৈতিক অবস্থা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়। কলের সাহায্যে তৈয়ারী করিতে পারায় অল্পব্যয়ে বহুল পরিমাণে সামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব হইল। এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য ব্যবসায়ীরা বাজার খুঁজিতে লাগিল। এমন সময়ে বৃটিশ ব্যবসায়ীরা ভারতে অবাধ বাণিজ্য করার সুযোগ পাইল। বৃটেনে তৈয়ারী মালে ভারতের বাজার ক্রমশঃ ছাইয়া গেল। ভারতীয়রা হাতে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট নানারূপ দ্রব্য তৈয়ারী করিত। এ দেশের কুটীর শিল্প বিশ্ববিখ্যাত ছিল। কিন্তু কলে তৈয়ারী বিদেশ হইতে আগত সুলভ দ্রব্যের সহিত ভারতীয় কুটীর শিল্প প্রতিযোগীতায় টিকিতে পারিল না। ফলে আমাদের দেশের কুটীর শিল্প বিনষ্ট হইল। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা অল্পমূল্যে ভারত হইতে কাঁচা মাল ক্রয় করিয়া নিজেদের দেশে চালান করিতে লাগিল এবং সেই কাঁচা মালে প্রস্তুত সামগ্রী এ দেশে রপ্তানী করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতে লাগিল। কৃষিকার্য ব্যতিরিকে ভারতীয়দের অন্ন সংস্থানের বিশেষ আর কোনও উপায় রহিল না। শিল্প ও বাণিজ্য ক্রমশঃ ইউরোপীয়দের হাতে চলিয়া গেল। তাহারা ভারতে বড় বড় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিল। ভারতীয়রা এই সকল প্রতিষ্ঠানে এবং কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থায় নিম্ন শ্রেণীর চাকরি করিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ এক চাকরি-জীবি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। অর্থবান ভারতীয়রা ব্যবসায় ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া তাহাদের মূলধন জমিতে খাটাইতে লাগিল। ভারতীয়রা মোটামুটি ভূম্যধিকারী, কৃষক ও চাকরিজীবি এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ

ভারতে বৃটিশ প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি এদেশে বিস্তার লাভ করে। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি ও চিন্তাধারা পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হয়। ইহার ফলে মানসিক ক্ষেত্রে এক নবজাগরণের সৃষ্টি হইল। পুরাতন ভারত নব জাত ইউরোপীয় কৃষ্টির সোনার কাঠির স্পর্শে নূতন প্রভাতে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া এক নূতন জগত দেখিতে পাইল।

শতাব্দীর পর শতাব্দী যাহা অন্ধ বিশ্বাসে মানিয়া লইয়াছিল তাহা যুক্তির দ্বারা বিচার করিয়া লইতে আরম্ভ করিল। অতএব সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের সূচনা হইল। মধ্যযুগ হইতে ভারত আধুনিক যুগে পদক্ষেপ করিল।

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)

এই নবযুগের প্রভাত-সূর্য ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। রামমোহনের সংস্কৃত ভাষায় ও হিন্দু শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি পুরাতন শাস্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করিতে চাহিলেন যে হিন্দুরা পৌত্তলিক বা বহু দেবতার উপাসক নহে। ব্রহ্মই তাহাদের একমাত্র উপাস্য। বহু যুগের আবর্জনা হিন্দু ধর্মের দেহে জমাট হইয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপ আবৃত করিয়াছে এবং হিন্দু ধর্ম নানারূপ অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হইয়াছে। এই অবস্থায় হিন্দু সমাজও নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে,—অতএব হিন্দুদের কুসংস্কার মুক্ত করিতে হইবে।



রাজা রামমোহন রায়

তিনি হিন্দুদের পুরাতন শাস্ত্রের সাহায্যে তাঁহার বক্তব্য প্রমাণ করেন। তাঁহার যুক্তি জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করার জন্য বাংলা ভাষায় তাঁহাকে বহু প্রবন্ধ লিখিতে হয়। বহু পণ্ডিত তাঁহার মত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করে। এই সকল তর্কবিতর্কের ফলে বাংলা গদ্য সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়।

তাঁহার ধর্মমত প্রচার করিবার জন্য তিনি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে একটি সংস্থা গঠন করেন। ইহাই ভবিষ্যতে ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হয়।

রামমোহন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। আমরা

দেখিয়াছি যে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্টে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বার্ষিক একলক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই অর্থ যখন সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হইতে লাগিল তখন রামমোহন তৎকালীন বড়লাট লর্ড অ্যামহার্ষ্টের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জানান। প্রতিবাদে তিনি বলেন যে সংস্কৃত শিক্ষা এই দেশকে অন্ধকারেই রাখিয়া দিবে ; বরং এই অর্থের সাহায্যে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা ও শরীর বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য একটি উচ্চবিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত। ডেভিড হেয়ারের সহযোগীতায় রামমোহন কয়েকজন ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের লইয়া পাশ্চাত্য-শিক্ষা প্রচলনের জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। উভয়ে মিলিয়া ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন। এই হিন্দু কলেজই পরবর্তীকালে হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত হয়।

হিন্দু সমাজ নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। রামমোহন সমাজ সংস্কারের জন্য বহু চেষ্টা করেন। লর্ড হেষ্টিংসের গভর্ণমেণ্ট যখন কতকগুলি ক্ষেত্রে সতীদাহ বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করেন তখন গোঁড়া হিন্দুরা সরকারের নিকট এই আইন রদ করিবার জন্য আবেদন করেন। রামমোহন এই আবেদনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গভর্ণর জেনারেলকে পত্র দেন। গভর্ণমেণ্টের আইন অমান্য হইতেছে কি না দেখিবার জন্য তিনি একটি সমিতি গঠন করেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ সকল ক্ষেত্রেই বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করেন তখন বহুলোকের স্বাক্ষর সম্বলিত এক প্রতিবাদ পত্র গভর্ণর জেনারেলের নিকট পেশ করা হয় এবং বিলাতেও এই ব্যাপার পুনর্বিচার করিবার প্রার্থনা জানান হয়। রামমোহন এই সকল চেষ্টা বাধা দিবার জন্য বড়লাটকে অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করেন এবং স্বয়ং বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহার চেষ্টায় ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ আদালত বেণ্টিঙ্কের পক্ষ সমর্থন করে। রামমোহন বহু-বিবাহ প্রথার বিরোধী ছিলেন এবং বিধবা বিবাহ সমর্থন করিতেন।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যও রামমোহন পরিশ্রম করেন। "ক্যালকাটা জারনাল" নামক ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদক জেমস্ সিল্ক্

বাকিংহাম তাঁহার সংবাদপত্রে সরকারকে ও সরকারী কর্মচারীদের যথেচ্ছা নিন্দা করিতেন। গভর্ণর জেনারেল মিঃ অ্যাডাম সরকারী অনুমতি বিনা কোনও সংবাদপত্র মুদ্রণ নিষেধ করিলেন। রামমোহন এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলেন। কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য রামমোহন চেষ্টা করেন। সৈন্যদলে অধিকতর সংখ্যায় ভারতীয়দের নিয়োগ, সংহিতাকারে আইন লিপিবদ্ধ করা, ফারসীর পরিবর্তে ইংরাজী সরকারী ভাষা হিসাবে প্রবর্তন, এই সকলের জন্যও তিনি চেষ্টা করেন। কোনও নূতন আইন প্রবর্তনের পূর্বে নেতৃস্থানীয় ভারতীয়দের সহিত আলোচনা করার দাবী তিনি জানান। ভারতীয়দের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিবার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

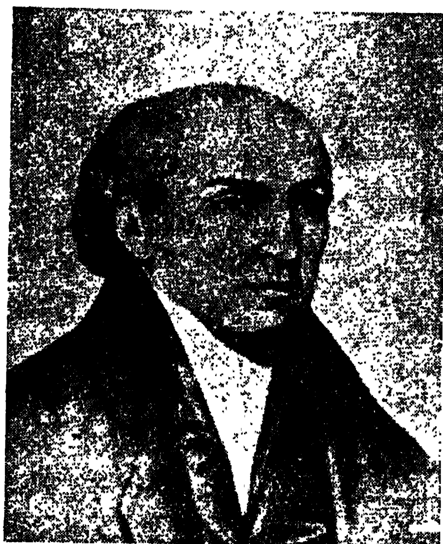
১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ব্রিষ্টল্ সহরে রাজা রামমোহন রায় পরলোক গমন করেন।

ইংরাজী শিক্ষার প্রসার

ইংরাজরা যখন আমাদের শাসনভার গ্রহণ করে তখন এদেশের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল টোলে ও মাদ্রাসাতে। ছাত্ররা সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী শিখিতে পারিত। শিক্ষার বিষয় ছিল সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায় ও দর্শন। বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, ইতিহাস, অর্থনীতি বা ভূগোল পাঠের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রই উচ্চ শিক্ষা পাইত। অধিকাংশই পাঠশালা এবং মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া সরস্বতী দেবীর নিকট বিদায় লইত। বাহিরের জগতের কোনও রূপ খবর পাইত না, পাইবার ইচ্ছাও রাখিত না।

আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষার গোড়াপত্তনের জন্য আমরা খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকদের নিকট ঋণী। যে সকল খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রসারে সহায়তা করেন তাহাদের মধ্যে উইলিয়ম কেরী অন্যতম। তিনি যখন বাংলায় আসেন তখন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকদের ভারতে আসিবার অনুমতি দিতেন না। গোপনে তিনি দিনেমারদের একটি জাহাজে কলিকাতায় আসেন। কয়েকবৎসর কলিকাতায় থাকিয়া তিনি

দিনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুরে গিয়া তথায় আগত আরও কয়েকজন ব্যাপ্টিষ্ট প্রচারকদের সহিত মিলিত হন। লর্ড ওয়েলেস্‌লী দিনেমার কর্তৃপক্ষকে ইঁহাদের ভারত হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য বলেন, কিন্তু শ্রীরামপুরের দিনেমার গভর্ণর এই অনুরোধ উপেক্ষা করেন। কিছুকাল পরে লর্ড ওয়েলেস্‌লী কেরীর সম্বন্ধে মত বদলাইয়া তাঁহাকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা, সংস্কৃত ও মারাঠি ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। ইহার পর কেরী শ্রীরামপুরে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার বন্ধুদ্বয় মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের সহিত যোগদান করেন। কেরী, মার্শম্যান্‌ ও ওয়ার্ড ইতিহাসে 'শ্রীরামপুর ত্রয়ী' নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা শ্রীরামপুর কলেজের গোড়াপত্তন করেন। শ্রীরামপুরে তাঁহারা একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং বাইবেলের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইংরাজী শিক্ষা ও বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহাদের দান অতুলনীয়।



উইলিয়াম কেরী

এই সময়ে বাংলাদেশে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইবার জন্য অধিকতর আগ্রহ দেখা যায়। আমাদের দেশের নেতৃস্থানীয় লোকরাও ইংরাজী স্কুল ও কলেজ স্থাপনের জন্য অগ্রণী হ'ন। এই কার্যে তাঁহারা বেসরকারী ইউরোপীয়দের যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হ'ন। ডেভিড হেয়ার ও রামমোহন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন ও

আলেকজাণ্ডার ডাফ্ নামে একজন স্কটিশ ধর্মযাজক জেনারেল অ্যাসেমব্লীজ ইন্‌ষ্টিটিসন্ স্থাপন করেন। এই কলেজ বর্তমানে 'স্কটিশ চার্চ কলেজ' নামে পরিচিত।

সরকারী পক্ষ হইতে প্রথমে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের কোনও চেষ্টা ছিল না। বেসরকারী চেষ্টায় প্রথম ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন হয় এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভের জন্য আমাদের প্রবল আগ্রহ থাকার জন্যই এই শিক্ষার দ্রুত প্রচলন হয়। আমরা দেখিয়াছি যে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস কলিকাতায় মুসলমানদের শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা স্থাপন করেন। আরবী, ফারসী ও মুসলমান আইন শিক্ষা দিবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্টে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা খরচের ব্যবস্থা হয়। বলা হয় যে এই অর্থ দুইটি কারণে খরচ করা যাইতে পারিবে, (১) ভারতে সাহিত্যচর্চার উৎকর্ষসাধন ও শিক্ষিত লোকদের উৎসাহ দান এবং (২) ভারতীয়দের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে বাংলায় শিক্ষা পরিচালনা করিবার জন্য একটি কমিটি অফ্ পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাক্শন নিয়োজিত হয় এবং কলিকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। এই সংস্থা সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী পুস্তক মুদ্রণ ও সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসা পরিচালনায় সমস্ত অর্থ ব্যয় করিতে থাকে। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার জন্য উৎসাহী ভারতীয়রা এবং খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকরা মিলিত হইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা দানের জন্য স্কুল ও কলেজ স্থাপন করিতে লাগিলেন এবং ইংরাজী পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয় করিবার জন্য 'স্কুল বুক্ সোসাইটি' নামে সংস্থার প্রতিষ্ঠা করিলেন। কমিটি অফ্ পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাকশন কর্তৃক প্রকাশিত আরবী ও ফারসী পুস্তকের তুলনায় বহুগুণ অধিক স্কুল বুক্ সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত ইংরাজী পুস্তকের বিক্রয় হইতে লাগিল।

ক্রমে কোন পথ অনুসরণ করা উচিত তাহা লইয়া কমিটি অফ্ পাব্লিক্ ইন্‌ষ্ট্রাকশনের সভ্যদের মধ্যেই মতদ্বৈধ উপস্থিত হইল। একদল ছিলেন সংস্কৃত ও আরবী শিক্ষার পক্ষে। অপর দল যুক্তি দেখাইলেন যে সরকারী

অর্থ ইংরাজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের জন্য ব্যয় করা উচিত। প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক আলেকজাণ্ডার ডাফ্ কমিটি অফ্ পাবলিক্ ইন্‌ষ্ট্রাকশনের সভ্য হওয়ার ফলে এই শেষোক্ত দলের সুবিধা হইল। অচিরে তাহাদের মতেরই জয়লাভ হইল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নূতন সনন্দলাভ করিল। এ যাবত ভারতীয়রা কোম্পানীর নিম্নপদস্থ কর্মচারী হইতে পারিত মাত্র। কিন্তু ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্টে বলা হইল যে উপযুক্ত ভারতীয়দের পক্ষে উচ্চপদ অধিকারে কোনও বাধা থাকিবে না। প্রাচীনপন্থায় শিক্ষিত লোকের পক্ষে এ সকল পদ অধিকার করা সম্ভব না থাকাতে ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার অধিকতর বিস্তারের আবশ্যকতা দেখা দিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইল এবং একজন বাঙ্গালী ছাত্র মধুসূদন গুপ্ত প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করিলেন। কমিটি অফ্ পাব্‌লিক ইনষ্ট্রাক্‌শনের নাম 'কমিটি অফ্ এডুকেশন্' দেওয়া হইয়াছিল। এই সময়ে গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের আইন সচিব মেকলে কমিটি অফ্ এডুকেশনের সভাপতি নিযুক্ত হ'ন। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত একমত হইয়া লর্ড বেন্টিঙ্ক স্থির করিলেন যে সরকারী অর্থ ইংরাজী শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হইবে।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। প্রতিযোগীতা-মূলক পরীক্ষার সাহায্যে সকল সরকারী পদে নিয়োগ করা হইবে তিনি এইরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। ইহার ফলে ইংরাজী শিক্ষার দ্রুত প্রসার হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস্ উড্ ভারতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার প্রসিদ্ধ পত্র প্রেরণ করেন। তিনি ভারতে যথেষ্ট সংখ্যক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজ স্থাপন করার আজ্ঞা দেন। মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দানের ও বেসরকারী বিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্য দানের ব্যবস্থা করার কথাও তিনি বলেন। সর্বোচ্চ শিক্ষার জন্য কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাবও তিনি দেন। এই আজ্ঞা অনুযায়ী কাজ করিবার জন্য সরকার একটি শিক্ষা বিভাগ স্থাপন করে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে বিশ্ববিদ্যালয়

াপিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি এ. পরীক্ষায় যে দুইজন াত্র কৃতকার্য হন তাঁহাদের মধ্যে একজন বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের উদ্গাতা ঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের ফলে কি ভাবে ভারতে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত ইল তাহার আলোচনা এই গ্রন্থের যথাস্থানে করা যাইবে।

মাজ সংস্কার

ইংরাজরা প্রথম হইতেই ভারতীযদের ধর্মবিশ্বাসে ও সামাজিক ব্যাপারে ম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকার নীতি অনুসরণ করে। নানারূপ অন্ধবিশ্বাসের ফলে ারতীয় সমাজে বহু কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু কোম্পানার কর্তৃপক্ষ দেশের লোকের মনে আঘাত দিতে অনিচ্ছুক থাকার জন্য ধর্মসংক্রান্ত বা ামাজিক কোনও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিত না। তাহারা খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকদের ারতে আসিয়া ধর্মপ্রচার করিতে অনুমতি দিত না। সরকার পরিচালিত কানও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও তাহারা ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে অস্বীকৃত ছিল। কন্তু ক্রমে মানবতার দাবীতে তাহারা এ সকল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইল। তাহারা সমাজ সংস্কার কার্যে বহু প্রগতিশীল ভারতীয়দের পূর্ণ হযোগীতা পাইয়াছিল।

শিশুহত্যা নিবারণ

কুসংস্কার জাত নৃশংস প্রথাগুলির মধ্যে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ প্রথম শিশুহত্যা নবারণ করে। কোনও কোনও নিঃসন্তান স্ত্রীলোক দেবতার নিকট মানত রিতেন যে তাহাদের একাধিক সন্তান হইলে একটি সন্তানকে গঙ্গাসাগরের ঙ্গমস্থলে জলে নিক্ষেপ করিবেন। মধ্য ও পশ্চিম ভারতে কন্যা সন্তান জন্মিলে ত্যা করার রীতি ছিল, কারণ বিবাহ দেওয়া কঠিন ছিল। ১৭৯৫ খৃঃ ও ১৮০২ ষ্টাব্দের আইনের দ্বারা উভয় প্রকার শিশু হত্যা দণ্ডনীয় বলিয়া ঘোষণা করা য়। তথাপি গোপনে এইরূপ হত্যা চলিতে থাকে। ক্রমশঃ পাশ্চাত্য শিক্ষা ভাবধারার প্রভাবে এই কুপ্রথা লোপ পায়।

সতীদাহ নিবারণ

ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল হইতেই মৃত স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন করা স্ত্রীর পক্ষে অতি পুণ্যকার্য্য বলিয়া গণ্য হইত। ধর্মের নামে বহু-স্ত্রীলোকের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আত্মীয় স্বজন তাহাদিগকে সহমরণে বাধ্য করিত। ১৮১২, ১৮১৫ ও ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সতীদাহ বন্ধ করিবার জন্য আইন বিধিবদ্ধ হয়। শিশুবিধবা, সন্তানসম্ভবা বিধবা এবং শিশুসন্তানের বিধবা জননীর সহমরণ বেআইনি করা হইল। কোনও অনিচ্ছুক বিধবাকে বলপূর্বক বা কৌশল পূর্বক এইরূপে দাহ করা দণ্ডনীয় হইল। এই সকল আইন সতীদাহ বন্ধ করিতে পারিল না। রাজা রামমোহন রায় বহু পরিশ্রমে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিলেন। গোঁড়া হিন্দুরা ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের আইনের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট প্রতিবাদ জানাইলেন। রামমোহন ও তাঁহার সহযোগীরা সতীদাহ শাস্ত্র সম্মত নহে বলিয়া প্রমাণ দেখাইয়া এই কুপ্রথা বন্ধ করিবার আবেদন করিলেন। বড়লাট লর্ড বেন্টিক্ ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সতীদাহ সর্বক্ষেত্রে বেআইনি এবং দণ্ডনীয় বলিয়া আইন বিধিবদ্ধ করিলেন।

ঠগী-দমন

একস্থান হইতে আর এক স্থান যাইতে হইলে সেকালে আজকালকার মতন সুবিধা ছিল না। সাধারণ লোককে নির্জন পথে পদব্রজে যাইতে হইত। সেইজন্য লোকে সচরাচর দলবদ্ধ হইয়া পথ চলিত। ঠগী সম্প্রদায়ের ডাকাতরা ছদ্মবেশে নিরীহ যাত্রীদের দলে মিশিয়া যাইত এবং সুযোগ পাইলেই তাহাদের নির্জন স্থানে লইয়া গিয়া হত্যা করিত। লর্ড বেন্টিংক্ কর্ণেল স্লীম্যান্‌কে ঠগী দলগুলি উচ্ছেদ করিবার ভার দেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে স্লীম্যান্ প্রায় তিন হাজার ঠগী গ্রেপ্তার করেন। ক্রমে ঠগীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ হয়।

দাসপ্রথা উচ্ছেদ

ভারতে অতি প্রাচীনকাল হইতে পশুর ন্যায় মানুষও ক্রয় বিক্রয় হইত। ধনীরা মানুষ ক্রয় করিয়া তাহাদের দাস নিযুক্ত করিত। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এই

দাসপ্রথা বেআইনি করা হয়। এই সময়ে ভারতে বহু লক্ষ দাস ছিল। দাসদের মুক্তি দেওয়ার বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলন হয় নাই।

নরবলি বন্ধ

ভারতের কোনও কোনও প্রদেশে, বিশেষতঃ আদিম অধিবাসীদের মধ্যে, নরবলি হইত। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে নরবলি বন্ধ করিবার জন্য আইন বিধিবদ্ধ হয়। কেবল আইন পাশ করিলেই নরবলি বন্ধ করা যাইবে না জানিয়া গভর্ণমেণ্ট কয়েকজন উপযুক্ত কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন। ক্যাম্প্‌বেল্‌ ও তাঁহার সহকর্মীদের চেষ্টায় এ প্রথার উচ্ছেদ হয়।

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক (১৮২৮-১৮৩৫)

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন না করিয়া এই অধ্যায় শেষ করা যায় না। তিনি ১৮২৮ হইতে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গভর্ণর জেনারেলের পদ অধিকার করেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দের মেয়াদ শেষ হওয়াতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে যখন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী নূতন সনন্দ লাভ করে তখন বড়লাট "বাঙ্গলার গভর্ণর জেনারেলের" পরিবর্তে "ভারতের গভর্ণর জেনারেল" পদবী লাভ করেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক প্রথম "ভারতের গভর্ণর জেনারেল"। যে কয়জন ভারত হিতৈষী ইংরাজ



লর্ড বেণ্টিঙ্ক

আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রাখিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে লর্ড বেন্টিঙ্ক অন্যতম। সতীদাহ নিবারণ, ঠগীদমন ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে সহায়তা করার জন্য তাঁহার নাম ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। শাসন সংস্কারের জন্যও তিনি স্মরণীয়। সরকারের বহু বিভাগে যে অপব্যয় হইতেছিল বেন্টিঙ্ক তাহা বন্ধ করেন এবং রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দের ফলে সকল সরকারী পদ যোগ্য ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত হওয়াতে বেন্টিঙ্ক বহু ভারতীয়কে উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। তিনি পুনরায় একই কর্মচারীকে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদ দেন। তাঁহার আমলে সব্‌জজ্‌ পদের সৃষ্টি হয় এবং আদালতে ফারসীর পরিবর্তে প্রদেশীয় ভাষা ব্যবহার আরম্ভ হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের শেষ অধ্যায়

লর্ড হেষ্টিংস যখন ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করেন তখন শতদ্রু হইতে ব্রহ্মপুত্র এবং হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত সমগ্র ভারতে বৃটিশ আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। মারাঠাদের দমনের পর এই বিশাল অঞ্চলে বৃটিশদের বিপক্ষে দাঁড়াইবার কোনও শক্তি ছিল না। কিন্তু এই সীমানার বাহিরে তখনও যে সকল শক্তি বিদ্যমান ছিল তাহারা ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিপন্ন করিতে পারে এইরূপ আশঙ্কা অমূলক ছিল না। ভারতের সীমানা প্রকৃতির দ্বারা নির্দিষ্ট। যতদিন না বৃটিশ সাম্রাজ্য এই স্বাভাবিক ভৌগলিক সীমানা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই ততদিন পর্যন্ত পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্তে কোনও শক্তির উত্থান কিম্বা সম্ভাব্য আক্রমণ সম্বন্ধে বৃটিশদের সচেতন থাকিতে হয়। এই কারণেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বৃটিশদের সহিত সিন্ধি,

আফগান এবং ঐ অঞ্চলের উপজাতিদের যুদ্ধ হয় এবং এই কারণেই পূর্বাঞ্চলেও বৃটিশদের ব্রহ্মরাজের সহিত সংঘর্ষ হয়। আবার যখন বৃটিশ সাম্রাজ্য ভারতের ভৌগলিক সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তখন সেই গণ্ডীর বাহিরে অবস্থিত বিদেশীয় শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা জন্মায়। এ যাবৎকাল বৃটিশরা নেপোলিয়নের অধীনে ফরাসী শক্তির অগ্রসরে ভীত ছিল। এখন তাহারা রুশদের এশিয়ায় অগ্রগতি সম্বন্ধে ত্রস্ত হইয়া পড়িল। ভারতের সীমানার মধ্যেও বৃটিশরা তাহাদের শক্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া বিপদের সম্মুখীন হইল। তাহাদের প্রভুত্ব স্থাপনের ফলে যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা পুঞ্জীভূত হইয়া এক অভূতপূর্ব বিস্ফোরণের সৃষ্টি হইল।

ভারতের পূর্ব সীমানার বাহিরে সাম্রাজ্য বিস্তার

ওলন্দাজদের নিকট হইতে যবদ্বীপ ও মশলা দ্বীপপুঞ্জ অধিকার ও নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর এই সকল অঞ্চল ওলন্দাজদের প্রত্যর্পণ এবং সিঙ্গাপুরে ইংরাজদের বসতি স্থাপন ইত্যাদি বিষয় চতুর্থ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে কি ভাবে চট্টগ্রাম হইতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের সমস্ত পূর্ব উপকূল ইংরাজদের হস্তগত হয় এবং ইংরাজরা ব্রহ্মদেশ অধিকার করে তাহা বলা হইবে। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ব্রহ্মরাজ্যের সহিত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিল। ক্রমে বৃটিশসাম্রাজ্যের পূর্বসীমানা ব্রহ্মদেশের সংলগ্ন হইল। আবার সেই সময়েই ব্রহ্মদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ইচ্ছুক এক নূতন রাজশক্তির অভ্যুদয় হইল।

প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ

ব্রহ্মদেশের রাজা ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে আরাকান অধিকার করেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে বর্মীরা মণিপুর দখল করে এবং ১৮২১ খৃষ্টাব্দে আসাম ব্রহ্মরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্মীরা এইভাবে দ্রুত ভারত সীমানায় আসিয়া পড়িল। অল্পকালের মধ্যেই তাহারা বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চলে হানা দিল। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তাহারা কাছাড় আক্রমণ করিলে বৃটিশদের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য হইল।

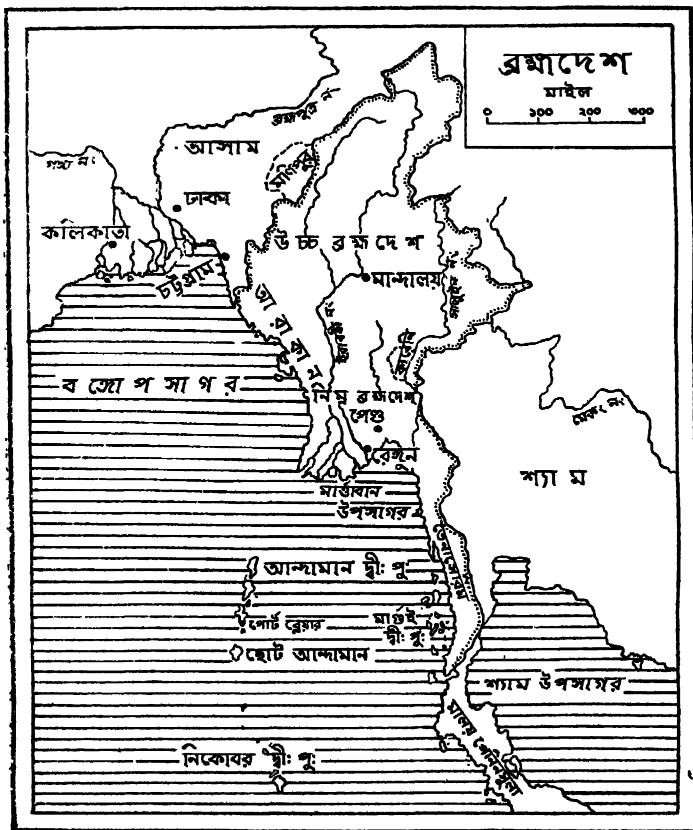
ইংরাজরা বর্মীদের সহিত বন্ধুত্ব বজায় রাখার বহু চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা এই উদ্দেশ্যে ১৭৯৫ ও ১৮১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চারবার ব্রহ্মরাজের নিকট দূত প্রেরণ করে। প্রতিবারেই বৃটিশ দূত ব্রহ্মরাজের সভায় অপমানিত হয়। কিন্তু ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে যখন ব্রহ্মরাজ বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চল আক্রমণ করিলেন এবং বাংলাদেশ দাবী করিলেন তখন যুদ্ধ করা ছাড়া আর গত্যন্তর রহিল না। ব্রহ্মরাজ তাঁহার প্রসিদ্ধ সেনাপতি বন্দুলাকে বহুসংখ্যক সৈন্য সহ বঙ্গদেশ হইতে ইংরাজদের বিতাড়িত করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। গভর্ণর জেনারেলকে বাঁধিয়া আনিবার জন্য একটি স্বর্ণশৃঙ্খলও বন্দুলার হাতে দিলেন।

তখন গভর্ণর জেনারেল ছিলেন লর্ড আমহার্ষ্ট (১৮২৩-১৮২৮)। ইংরাজরা স্থলপথ ও জলপথ দিয়া বর্মীদের আক্রমণ করিল। এক ইংরাজ নৌ-বাহিনী ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রেঙ্গুন দখল করিল। বন্দুলা চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। এখন তিনি সমুদ্রের দিক দিয়া আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য রেঙ্গুনে ইংরাজ সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। পরাজিত হইয়া তিনি রেঙ্গুনের ছয় মাইল উত্তরে ডোনাবিউ নামক স্থানে ইংরাজদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বন্দুলার সৈন্যদল খুঁটির বেড়া রচনা করিয়া দৃঢ়ভাবে অবস্থিত ছিল। ইংরাজরা তাহাদের আক্রমণ করিয়া কিছুই করিতে পারিল না। কিন্তু ইংরাজদের ভাগ্যে বন্দুলার আকস্মিক-ভাবে গুলির আঘাতে মৃত্যু হইল। তাঁহার সৈন্যদল সেনাপতির মৃত্যু সংবাদে পলায়ন করিল (এপ্রিল ১৮২৫)। বন্দুলা রেঙ্গুনে চলিয়া আসাতে ইংরাজদের আসাম ও কাছাড় দখল করা সহজ হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ইংরাজরা মণিপুর দখল করে।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংরাজ সৈন্য ব্রহ্মদেশের রাজধানীর নিকটবর্তী হইলে ইয়ান্দাবু নামক স্থানে সন্ধি হয়। ব্রহ্মরাজ ইংরাজদের আসাম, আরাকান ও টেনাসেরিম্ ছাড়িয়া দেন এবং কাছাড় ও মনিপুরে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া স্বীকৃত হন। ক্ষতিপূরণ হিসাবে ইংরাজরা এক কোটি টাকা পায়।

দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ

বর্মীরা এই পরাজয়ের অপমান ভুলিতে পারিল না। ইংরাজদের উপর তাহাদের বিদ্বেষ প্রবলতর হইল। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের পর ব্রহ্মরাজের সভায় একজন ইংরাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বর্মীরা তাঁহাকে অপমান করিয়া



তাড়াইয়া দিল। তাহারা ইংরাজ বণিকদের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। এই সকল ঘটনার পর বড়লাট লর্ড ডালহৌসী ব্রহ্মরাজের নিকট

ক্ষতিপূরণ দাবী করিলেন। এই দাবীতে ব্রহ্মরাজ কর্ণপাত করিলেন না। তখন ডালহৌসী ল্যাম্বার্ট নামক একজন কর্মচারীকে রেঙ্গুনে পাঠাইলেন। ল্যাম্বার্ট বর্মীদের একটি জাহাজ দখল করিলেন। এই ব্যাপারে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইংরাজরা প্রোম ও পেগু দখল করিল। যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও ব্রহ্মরাজ কোনও সন্ধি স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন ডালহৌসী পেগু বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা পত্র প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্মরাজ্যের সমুদ্রের সহিত যোগাযোগ সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন হইল। বঙ্গোপসাগরের সমস্ত পূর্ব উপকূল ইংরাজদের হস্তগত হইল।

তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডাফ্‌রিন্‌ গভর্ণর জেনারেল থাকা কালে তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ হয়। এই সময়ে ব্রহ্মরাজ ছিলেন থী-ব। তিনি ফরাসীদের বহুপ্রকার বাণিজ্য সুবিধা দিলেন এবং নানা ভাবে ইংরাজদের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি একটি ইংরাজ কোম্পানীকে ২৩ লক্ষ টাকা জরিমানা করিলেন এবং কোম্পানীর কয়েকজন কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করিলেন। ইহার ফলে তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুই সপ্তাহের মধ্যে ভারতীয় সৈন্য মান্দালয় অধিকার করিল। থী-ব ভারতে নির্বাসিত হইলেন এবং ব্রহ্মরাজ্যের অবশিষ্টাংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের ষাট বৎসরের মধ্যে সমগ্র ব্রহ্মদেশ ইংরাজদের হস্তগত হইল।

ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে বৃটিশ শক্তির অগ্রগতি

প্রথম শিখ যুদ্ধ

চতুর্থ পরিচ্ছেদে শতদ্রু নদীর পূর্বদিকে অবস্থিত শিখ রাজ্যগুলির উপর ইংরাজদের প্রভাব বিস্তার ও রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি স্থাপনের কথা আমরা পাঠ করিয়াছি। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর ছয় বৎসর পাঞ্জাবে অরাজক অবস্থা চলে। অবশেষে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের বালক-পুত্র দিলীপ সিংহ রাজা হন এবং রাজমাতা, লাল সিংহ ও তেজ সিংহ

নামক দুইজন মন্ত্রীর সাহায্যে রাজকার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। কিন্তু খালসা সৈন্য এত প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহাদের সংযত রাখিবার শক্তি ইঁহাদের ছিল না। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে শিখ সৈন্যদল শতদ্রু নদী পার হইয়া বৃটিশ অধীনস্থ অঞ্চল আক্রমণ করিল। গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মুদ্‌কী, ফিরোজশা ও আলিওয়ালের যুদ্ধে শিখরা ইংরাজদের নিকট পরাস্ত হইল। সোব্রাঁয়োর যুদ্ধে বহু শিখ সৈন্য নিহত হইল। শিখরা শতদ্রুর পশ্চিমে পলায়ন করিল। ইংরাজরা লাহোর অধিকার করিল এবং শিখরা ইংরাজদের সর্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। শতদ্রু নদীর পূর্বদিকের অঞ্চল, শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী জলন্দর দোয়াব, কাশ্মীর ও হাজারা জেলা ছাড়িয়া দিতে শিখরা বাধ্য হইল। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংরাজরা শিখদের নিকট হইতে বহু অর্থ পাইল। শিখরা ২০ হাজার পদাতিক ও ১২ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিক রাখিতে পারিবে না বলিয়া স্বীকৃত হইল। দিলীপ সিংহ রাজা থাকিলেন ও লাল সিংহের মন্ত্রিপদ বজায় রহিল। তাঁহারা বৃটিশ প্রতিনিধি স্যার হেন্‌রী লরেন্সের তত্ত্বাবধানে রাজকার্য চালাইবেন বলিয়া ব্যবস্থা হইল। একদল বৃটিশ সৈন্য আট বৎসরের জন্য লাহোরে অবস্থান করিবে, এই সর্তেও শিখরা রাজী হইল। স্যার হেন্‌রী লরেন্সের বিরোধীতা করাতে রাজমাতা নির্বাসিত হইলেন। ইংরাজরা জম্মুর রাজা গোপাল সিংহকে কাশ্মীর বিক্রয় করিল। এই ভাবে বর্তমান কাশ্মীর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল।

দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ

শিখরা তাহাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, এমন সময়ে ইংরাজদের সহিত সংঘর্ষের এক কারণ উপস্থিত হইল। দেওয়ান মুলরাজ মুলতানের শাসনকর্তা ছিলেন। ইংরাজরা তাঁহার বিরুদ্ধে কুশাসনের অভিযোগ আনিলে পর তিনি পদত্যাগ করিলেন। তাঁহার পরিবর্তে একজন নূতন শিখ শাসনকর্তা নিযুক্ত হইল। তখন মুলরাজের অনুচরেরা দুইজন ইংরাজ কর্মচারীকে হত্যা করিল এবং মুলরাজ পুনরায় মুলতান দখল করিলেন।

বড়লাট লর্ড ডাল্‌হৌসী শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন (১৮৪৮ খৃঃ)। ইংরাজরা মুলতান অবরোধ করিল। চার মাস অবরুদ্ধ থাকার পর মুলরাজ পরাজয় স্বীকার করিলেন এবং নির্বাসিত হইলেন। মুলরাজের পরাজয়ের পূর্বেই ঝিলাম নদীর তীরে চিলিয়ানওয়ালা নামক স্থানে ইংরাজদের সহিত শিখদের ভীষণ যুদ্ধ হয়। বহু ইংরাজ সৈন্য হতাহত হয়, কিন্তু যুদ্ধের ফল অনিশ্চিত থাকে। কিছুকাল পরে চিনাব নদীর নিকট গুজরাট নামক স্থানে ইংরাজরা শিখদের সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করে। লর্ড ডাল্‌হৌসী সমগ্র পাঞ্জাব বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। দিলীপ সিংহকে বৃত্তি দিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। স্যার হেন্‌রী লরেন্স, তাঁহার ভ্রাতা জন্ লরেন্স ও আর একজন কর্মচারীকে লইয়া পাঞ্জাব শাসনের জন্য একটি বোর্ড গঠিত হয়। এই বোর্ডের অধীনে পাঞ্জাবের দ্রুত উন্নতি হয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডাল্‌হৌসী এই বোর্ড রদ করিয়া দেন এবং জন্ লরেন্সকে পাঞ্জাবের চীফ্ কমিশনার নিযুক্ত করেন।

প্রথম আফগান যুদ্ধ

রুশ সাম্রাজ্য আফগানিস্থানের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। লর্ড মিণ্টোর সময় হইতেই ইংরাজরা রুশদের পারস্য ও আফগানিস্থানে প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনায় ভীত ছিল। ক্রমশঃ তাহাদের মনে রুশভীতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্থানের অধিপতি শাহ সুজা সিংহাসনচ্যুত হন এবং কিছুকাল পরে লুধিয়ানাতে ইংরেজদের আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন। কয়েক বৎসর গোলোযোগের পর দোস্ত মহম্মদ খাঁ কাবুল ও গজনীতে আধিপত্য স্থাপন করেন। আফগানিস্থানে অরাজকতার সুযোগ লইয়া রণজিৎ সিংহ পেশোয়ার দখল করেন এবং পারস্যরাজ হিরাট আক্রমণ করেন।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। তখন ইংলণ্ডে বৈদেশিক ব্যাপারের মন্ত্রী ছিলেন লর্ড পামারষ্টোন্। লর্ড পামারষ্টোন্ রুশদের অভিসন্ধি হইতে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা করার অবশ্যকতা সম্বন্ধে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডকে বিশেষ সচেতন থাকার জন্য

উপদেশ দেন। লর্ড অকল্যাণ্ড ক্যাপ্টেন বার্ণস্‌কে দোস্ত মহম্মদের সহিত একটি বাণিজ্য চুক্তি করিবার জন্য কাবুলে প্রেরণ করিলেন। রাজনীতি আলোচনাই কিন্তু বার্নসের দৌত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। দোস্ত মহম্মদ পেশোয়ার উদ্ধারের জন্য ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু রণজিৎ সিংহকে ইংরাজরা অসন্তুষ্ট করিতে পারিল না। অতএব বার্ণসের দৌত্য ব্যর্থ হইল ও দোস্ত মহম্মদ রুশিয়ার প্রেরিত দূতের সহিত আলাপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় লর্ড অকল্যাণ্ড ইংরাজদের অনুগত কোনও ব্যক্তিকে আফ্‌গানিস্থানের সিংহাসনে বসাইতে হইবে বলিয়া স্থির করিলেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে রণজিৎ সিংহ ও লুধিয়ানাবাসী শাহ সুজার সহিত ইংরাজরা একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিল। এই সন্ধির উদ্দেশ্য ছিল শাহ সুজাকে কাবুলের সিংহাসন অধিকার করিতে সাহায্য দান। দোস্ত মহম্মদ ইংরাজদের সহিত কোনও শত্রুতা করেন নাই। তথাপি ইংরাজ সৈন্য আফগানিস্থান আক্রমণ করিয়া কাবুল দখল করিল। দোস্ত মহম্মদ পলায়ন করিলেন এবং ইংরাজরা শাহ সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে বসাইলেন। ইংরাজ প্রতিনিধি স্যার উইলিয়ম ম্যাক্‌নটেন্ প্রকৃত শাসনকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। দশ হাজার বৃটিশ সৈন্য কাবুলে অবস্থান করিতে লাগিল।

আফগানদের মনে বিজেতাদের প্রতি স্বাভাবিক বিদ্বেষ ইংরাজদের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে আরও বর্দ্ধিত হইল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে আফগানরা দোস্ত মহম্মদের পুত্র আকবর খাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং ক্যাপ্টেন বার্ণস্‌কে হত্যা করিল। কাবুলে বৃটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন বৃদ্ধ জেনারেল এলফিন্‌ষ্টোন্। তাঁহার অসুস্থতা ও অক্ষমতার সুযোগ লইয়া ইংরাজ সৈন্যদল একেবারে অধঃপাতে গিয়াছিল। তাহারা বিদ্রোহ দমন করিতে পারিল না। আফগানরা ইংরাজদের খাদ্য ও অস্ত্রভাণ্ডার লুণ্ঠন করিল। উপায়ন্তর না দেখিয়া ইংরাজরা আকবর খাঁর সহিত সন্ধি করিল। আকবর খাঁ ইংরাজ সৈন্যকে নিরাপদে আফগানিস্থানের বাহিরে লইয়া যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কয়েকদিন পরে আফগানরা বৃটিশ প্রতিনিধি ম্যাক্‌নটেন্‌কে হত্যা করিল। তখনও বৃটিশ সৈন্য কোনও প্রতিশোধ লইল না। ১৮৪২

খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী আকবর খাঁর প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া চার হাজার ইংরাজ সৈন্য বার হাজার অনুচরসহ ভারত অভিমুখে যাত্রা করিল। ১৩ই জানুয়ারী তাহাদের মধ্যে মাত্র এক ব্যক্তি, ডক্টর ব্রাইডন্, অর্দ্ধমৃত অবস্থায় জালালাবাদে পৌঁছিলেন। পার্বত্য পথে, শীতে, অনাহারে ও আফগানদের গুলিতে ষোল হাজার লোক দেহরক্ষা করিল। আফগানিস্থান বিজয়ের এই শোচনীয় পরিণতির পর লর্ড অকল্যাণ্ড স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন ও লর্ড এলেন্‌বরো বড়লাট হইলেন।

লর্ড এলেন্‌বরো আফগানিস্থানে এক নূতন অভিযান প্রেরণ করিলেন। ইংরাজ সৈন্য পুনরায় কাবুল অধিকার করিল। ইতোমধ্যে শাহ সুজাকে আফগানরা হত্যা করিয়াছিল। ইংরাজরা দোস্ত মহম্মদকে কাবুলের সিংহাসন ফিরাইয়া দিল এবং আফগানিস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিল।

সিন্ধু বিজয়

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সিন্ধু প্রদেশ তিন জন শাসকের অধীনে ছিল। মধ্য সিন্ধুর রাজধানী ছিল হায়দ্রাবাদ। পূর্ব সিন্ধুর আমীর মীরপুরখাস্ নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। উত্তর সিন্ধুর আমীর খয়েরপুরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ফরাসীদের ভয়ে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো সিন্ধু প্রদেশের আমীরদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া সন্ধি পত্র স্বাক্ষর করেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্ক সিন্ধুর আমীরদের নূতন সন্ধিতে আবদ্ধ করেন। স্বাক্ষরকারীরা পরস্পরের রাজ্যের উপর কোনও লোভ করিবেন না বলিয়া স্বীকৃত হন। ভারতীয় বণিকরা অবাধে সিন্ধুপ্রদেশে জলপথে ও স্থলপথে যাতায়াত করিতে পারিবে, কিন্তু কোনও ইংরাজ বণিক সিন্ধুদেশে বসবাস করিতে পারিবে না। বৃটিশ সৈন্যবাহিনী সিন্ধু প্রদেশে প্রবেশ করিবে না। এইরূপ সর্তেও ইংরাজরা স্বীকৃত হইল। প্রথম আফগান যুদ্ধের সময়ে লর্ড অকল্যাণ্ড এই চুক্তি ভঙ্গ করিলেন। বোম্বাই প্রদেশ হইতে প্রেরিত বৃটিশ সৈন্যদল সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া আফগানিস্থানে পৌঁছায়। স্বয়ং চুক্তি ভঙ্গ করিয়া লর্ড অকল্যাণ্ড আমীরদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ আনেন

এবং সিন্ধুদেশে কয়েকটি স্থান অধিকার করেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি আমীরদের একটি নূতন সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করেন। একদল ইংরাজ সৈন্য সিন্ধু দেশে থাকিবে এবং তাহাদের খরচ বাবদ আমীররা বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা দিবেন এই ব্যবস্থা হইল। এইভাবে সিন্ধুদেশের স্বাধীনতা খর্ব হইল। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের পর লর্ড এলেন্‌বরো গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। তিনি আমীরদের সহিত যুদ্ধ বাধাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে স্যার চার্লস নেপিয়ারকে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া সিন্ধুদেশে পাঠাইলেন। নেপিয়ারের অত্যাচারে সিন্ধুবাসীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং ইংরাজদের আক্রমণ করিল। এইভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। সিন্ধুর আমীররা পরাজিত ও নির্বাসিত হইলেন এবং লর্ড এলেন্‌বরো সিন্ধুদেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন (১৮৪৩)। ইংরাজ ঐতিহাসিকরাও সিন্ধুর আমীরদের সহিত লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ও লর্ড এলেন্‌বরোর ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন।

ভারতের মধ্যে ইংরাজশক্তির বিস্তার

লর্ড হেষ্টিংসের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন হইতে সিপাহী বিদ্রোহ বা ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত ইংরাজরা ভারতে তাহাদের শক্তি অধিকতর দৃঢ়রূপে স্থাপনের ব্যবস্থা করে। যে সকল ভারতীয় রাজ্যগুলি নামে মাত্র স্বাধীন ছিল তাহাদের বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত করার নীতি তাহারা অনুসরণ করে। লর্ড বেন্টিঙ্কের রাজ্যবিস্তারের দিকে লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁহাকেও নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগ করিতে হয়। মহীশূর ও কুর্গ এই দুইটি প্রদেশ সুশাসিত হইতেছিল না বলিয়া তিনি উভয়কে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। কাছাড়ের রাজার মৃত্যু হওয়াতে বেন্টিঙ্ক কাছাড় প্রদেশ ইংরাজ শাসনাধীনে আনিলেন। আসামে জয়ন্তিয়া অঞ্চলও বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সংযুক্ত হইল।

ইংরাজদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করিতেছে এই সন্দেহে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড কার্হ্লের নবাবের রাজ্য দখল করেন। তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধের পর শতদ্রু নদীর দক্ষিণে সর্বাপেক্ষা প্রবল ভারতীয় সামরিক শক্তি ছিল গোয়ালিয়ার রাজ্য। দৌলতরাওর মৃত্যুর পর গোয়ালিয়ার রাজ্যের ক্ষমতা হস্তগত

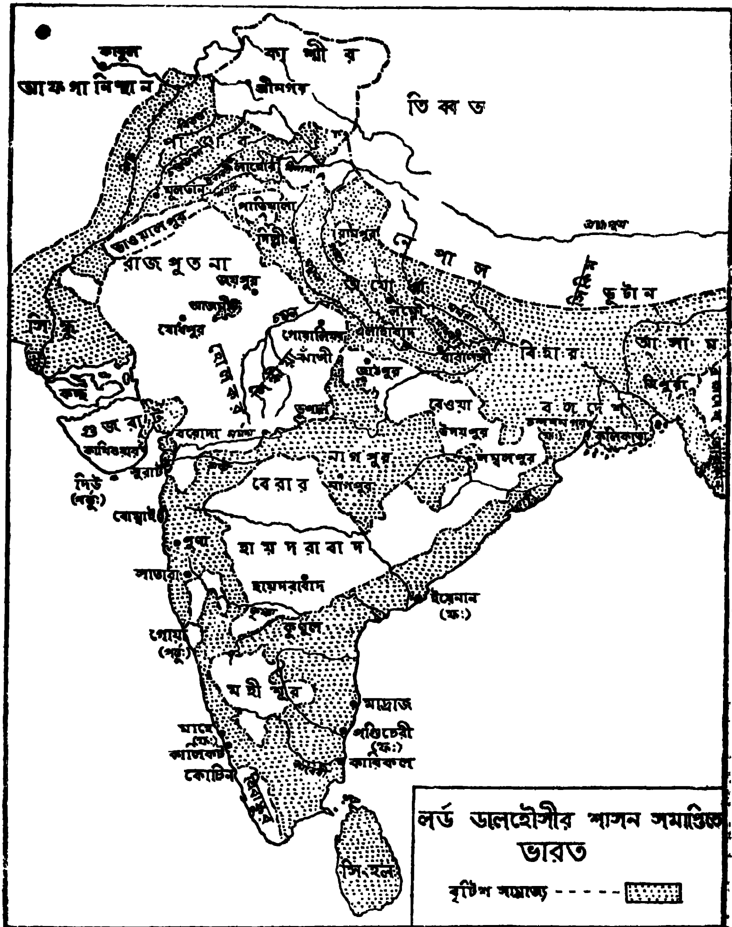
করিবার জন্য যে সকল আভ্যন্তরীন গোলযোগ উপস্থিত হয় তাহার ফলে প্রকৃত ক্ষমতা সৈন্যাধ্যক্ষের হাতে চলিয়া যায়। লর্ড এলেন্‌বরো এই পরিস্থিতি বৃটিশ ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর মনে করিয়া গোয়ালিয়ার আক্রমণ করিলেন (১৮৪৩ খৃঃ)। গোয়ালিয়ারের সৈন্য পরাস্ত হইল এবং একজন বৃটিশ প্রতিনিধির অধীনে রাজ্য পরিচালনার ব্যবস্থা হইল।

লর্ড ডাল্‌হৌসী (১৮৪৮-১৮৫৬)

লর্ড ডাল্‌হৌসী বহু ভারতীয় রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। কোনও রাজা অপুত্রক হইলে দত্তকপুত্র লইয়া তাহাকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করা প্রথা ছিল। লর্ড ডাল্‌হৌসী স্থির করিলেন যে ইংরাজদের আশ্রিত কোনও রাজ্যে দত্তকপুত্র উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না। এইরূপ কোনও রাজ্যের রাজা অপুত্রক হইলে রাজার মৃত্যুর পর সেই রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। ইহা ইতিহাসে doctrine of lapse বা স্বত্ববিলোপ নীতি নামে পরিচিত। এই নীতি অনুযায়ী সাতারা, ঝান্সি, নাগপুর প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য বাজেয়াপ্ত হইল।

সিকিমের রাজা দুইজন ইংরাজ কর্মচারীকে কারারুদ্ধ করেন। শাস্তি হিসাবে লর্ড ডাল্‌হৌসী সিকিম রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিলেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটকের নবাবের মৃত্যু হইলে পর ডাল্‌হৌসী তাঁহার কোনও উত্তরাধিকারীকে নবাব বলিয়া স্বীকার করিলেন না। তাঞ্জোরের রাজার মৃত্যুর পর ডাল্‌হৌসী তাহার উত্তরাধীকারীর রাজা উপাধি ও বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বৃত্তিভোগী দ্বিতীয় বাজীরাওর মৃত্যু হইলে ডাল্‌হৌসী তাঁহার দত্তকপুত্র নানা সাহেবকে বৃত্তি দিতে অস্বীকৃত হইলেন। ইংরাজ সৈন্য পালনের জন্য অঙ্গীকৃত টাকা দিতে না পারার অপরাধে হায়দ্রাবাদের নিজামকে বেরার প্রদেশ ইংরাজদের হস্তে সমর্পণ করিতে হয়। অযোধ্যার নবাব অলস ও অপটু ছিলেন। ফলে তাঁহার রাজ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। ডাল্‌হৌসী অযোধ্যা রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহকে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া কলিকাতায় নির্বাসিত করা হইল।


কাবুল
আফগানিস্থান
কাশ্মীর
শ্রীনগর
তিব্বত
মুলতান
রাজপুতনা
জয়পুর
যোধপুর
রামপুর
নেপাল
অযোধ্যা
ভুটান
আসাম
সিন্ধু
কচ্ছ
গুজরাট
বরোদা
গোয়ালিয়র
ঝাঁসী
এলাহাবাদ
বারাণসী
বিহার
রেওয়া
বঙ্গদেশ
নাগপুর
জব্বলপুর
কলিকাতা
দিউ
(পর্তু:)
সুরাট
বোম্বাই
বেরার
হায়দরাবাদ
পুণা
সাতারা
ইয়েনাম
(ফ্র:)
গোয়া
(পর্তু:)
কুর্ণুল
মহীশূর
মাদ্রাজ
পণ্ডিচেরী
(ফ্র:)
কালিকট
কারিকল
কোচিন
সিংহল
লর্ড ডালহৌসীর শাসন সমাপ্তিতে ভারত
বৃটিশ সাম্রাজ্য

দত্তক লইবার প্রথা ভারতে চিরাচরিত ছিল। এই প্রথা অস্বীকার করাতে এবং নানা কারণ দর্শাইয়া ভারতীয় রাজ্যগুলির অস্তিত্ব লোপ করার জন্য ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঘোর অসন্তোষ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। অন্যান্য কারণজনিত বিক্ষোভের সহিত মিশ্রিত হইয়া এই অসন্তোষ সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে প্রকাশ পাইল।



লর্ড ডাল্‌হৌসি

যাহা হউক, ডাল্‌হৌসী আমাদের দেশের উন্নতির জন্যও বহু পরিশ্রম করেন। তাঁহার সময়েই ভারতবর্ষে প্রথম রেল লাইন খোলা হয়। তিনিই এই দেশে টেলিগ্রাফ্‌ লাইনের স্থাপনকর্তা। তাঁহার শাসনকালে পূর্তবিভাগের সৃষ্টি হয় এবং বহু বড় বড় রাস্তা নির্মাণ করা হয় ও অনেক খাল খনন করা হয়। সেকালে কলিকাতা হইতে বোম্বাইতে ডাকে পত্র প্রেরণ করিতে এক টাকা মাশুল লাগিত। ডাল্‌হৌসীর শাসনকালে দুই পয়সায় পত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়।

এতকাল গভর্ণর জেনারেল ব্যতীত বাংলার কোনও পৃথক শাসনকর্তা ছিল না। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বাংলার শাসনের জন্য একজন লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর নিযুক্ত হন।

লর্ড ক্যানিং (১৮৫৬—১৮৬২)

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডাল্‌হৌসী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিলেন ও লর্ড ক্যানিং বড়লাট হইলেন। ১৮৬২ খৃঃ পর্যন্ত তিনি এই পদ অধিকার করেন। তাঁহার আমলে কোম্পানীর রাজত্বকাল শেষ হয় ও মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। সিপাহী বিদ্রোহ নামে পরিচিত কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা লাভের যুদ্ধের ফলে এই পরিবর্তন হয়।

সিপাহী বিদ্রোহের কারণ

সিপাহী বিদ্রোহের কারণগুলিকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যায় ;—রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক, ধর্মসম্বন্ধীয় ও সৈন্য সংক্রান্ত। রাজনৈতিক কারণগুলির মূলে ছিল ডাল্‌হৌসীর সাম্রাজ্য বিস্তার। দত্তকপুত্র গ্রহণের অধিকার অস্বীকার করিয়া ও কুশাসনের অজুহাতে ডাল্‌হৌসী সাতারা, ঝান্সি, নাগপুর, কর্ণাটক, তাঞ্জোর ও অযোধ্যা প্রভৃতি রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করাতে দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। ডাল্‌হৌসী দিল্লীর বাদশাহের উপাধিলোপের প্রস্তাব আনিয়া ও অযোধ্যা রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া মুসলমানদের মনে আঘাত দেন। দ্বিতীয় বাজীরাওর মৃত্যুর পর তাঁহার দত্তকপুত্র নানা সাহেবের বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেওয়াতে বহু হিন্দুদের মনে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। রাজ্যচ্যুত ও বৃত্তিচ্যুত ব্যক্তিদের মধ্য হইতেই কেহ কেহ সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন। এই বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে ছিলেন বৃত্তিচ্যুত নানাসাহেব ও তাঁহার অনুচর তাঁতিয়া টোপী, ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই, সম্রাট বাহাদুর শাহের আত্মীয় ফিরোজশাহ, অযোধ্যার বিতাড়িত নবাবের উপদেষ্টা আহমাতুল্লা ও জমিদারী হইতে বঞ্চিত বিহারের কুনওয়ার সিংহ।

রাজ্যচ্যুত ও বৃত্তিচ্যুত রাজন্যবর্গের পরিবার, অনুচর ও কর্মচারীদের আয়ের উপায় বন্ধ হইয়া যাওয়াতে তাহাদের মধ্যে অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইল। ফলে তাহাদের মনে ইংরাজদের উপর তীব্র বিদ্বেষ জন্মিল। সতীদাহ নিবারণ, হিন্দু বিধবা বিবাহ সমর্থক আইন প্রণয়ন, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার, রেল লাইন ও টেলিগ্রাফ প্রবর্তন ইত্যাদি জনহিতকর কার্যের ফলে যে নূতন যুগের সূচনা হইল তাহাতে যেমন অনেকেই উৎফুল্ল হইল, তেমন এই সকল কার্যের মধ্যে অনেকেই ইংরেজদের দুরভিসন্ধি রহিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিল। তাহারা মনে করিতে লাগিল যে সমাজ ও ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া ভারতীয় প্রজাদের খৃষ্টান করাই ইংরাজদের উদ্দেশ্য। কয়েকজন খৃষ্টান পাদ্রীর অসংযত ব্যবহারেও এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। এই অসন্তোষ সিপাহী সৈন্যদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়াতে অবস্থা সঙ্কটাপন্ন

হইল। ইতোপূর্বেই হিন্দু সিপাহীরা ধর্মরক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। নিষিদ্ধ "কালাপানি" অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মদেশে যাইতে হওয়াতে তাহাদের মধ্যে হিন্দুত্বের হানি হইয়াছে বলিয়া তাহাদের আত্মীয়স্বজন মনে করিতেছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য বিদেশে প্রেরণের প্রস্তাবে সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। এই জন্য লর্ড ক্যানিং ঘোষণা করেন যে, আবশ্যক হইলে ভারতের বাহিরে যাইতে হইবে এই সর্তে সিপাহীদের স্বীকৃত হইতে হইবে। এই আদেশের অন্তরালে হিন্দুদের জাতি নষ্ট করিবার উদ্দেশ্য লুক্কায়িত রহিয়াছে বলিয়া প্রচার আরম্ভ হইল। এই সময়ে "এন্‌ফিল্ড্‌ রাইফেল্‌" নামে সিপাহীদের নূতন একপ্রকার বন্দুক দেওয়া হইল। এই বন্দুকে ভরিবার টোটা দাঁত দিয়া কাটিয়া ব্যবহার করিতে হইত। ইংরাজদের ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্থ লোকেরা প্রচার করিল যে বন্দুকের টোটার আবরণ গরু ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত এবং এই নূতন প্রকার বন্দুক প্রচলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ধর্মনাশ করা। তাহারা আরও রটনা করিল যে পলাশী যুদ্ধের একশত বৎসর পরেই ভারতে ইংরাজ রাজত্বের অবসান হইবে। পৃথিবীর নানা স্থানে ইংরাজরা যুদ্ধে লিপ্ত থাকাতে ভারতে গোরা সৈন্যের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। দিল্লীতে ও আলাহাবাদে কেবল ভারতীয় সিপাহীদল রাখা হইয়াছিল এবং আলাহাবাদ হইতে কলিকাতা পর্যন্ত যে সকল সামরিক ঘাঁটি ছিল তাহাদের মধ্যে কেবলমাত্র দানাপুরে একদল গোরা সৈন্য ছিল। নানা সাহেব প্রমুখ ইংরাজ বিদ্বেষীরা মনে করিল যে ইংরাজদের ভারত হইতে বিতাড়িত করিবার ইহাই সুবর্ণ সুযোগ।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে ভারতের গ্রামে গ্রামে চাপাটি বিতরণ ও প্রত্যেক সেনাবাসে পদ্মফুল পাঠান আরম্ভ হইল। ইহার অর্থ ইংরাজরা বুঝিতে পারিল না।

বিদ্রোহ

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে জানুয়ারী দমদমের সিপাহীরা প্রকাশ্যভাবে নূতন টোটা ব্যবহারে আপত্তি করিল। ঐ বৎসর ২৯ শে মার্চ ব্যারাকপুরে সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে কুচকাওয়াজের স্থানে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষকে হত্যা করে। অন্যান্য

সিপাহীরা তাহাকে বাধা দিল না। মঙ্গল পাণ্ডের মৃত্যুদণ্ড হইল এবং অন্যান্য সিপাহীরা নিয়মানুযায়ী শাস্তি পাইল। ইহার পর ব্যারাকপুরে নানাস্থানে অগ্নিকাণ্ড হইতে লাগিল। মীরাটে কয়েকজন সিপাহী নূতন টোটা ব্যবহার করিতে অস্বীকার করাতে শাস্তি পাইল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে মীরাটের অন্যান্য সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া শাস্তিপ্রাপ্ত সিপাহীদের কারাগার হইতে মুক্তি দিল এবং কয়েকজন ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষের বাসস্থানে অগ্নিসংযোগ করিয়া তাহাদের হত্যা করিল। পরদিন প্রাতে তাহারা দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিল। বহু সিপাহীদল তাহাদের সহিত যোগদান করিল এবং দিল্লীতে আসিয়া বৃদ্ধ মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। এই সময়ে স্যার হেন্‌রী লরেন্স লক্ষ্ণৌতে চীফ্ কমিশনার ছিলেন। তিনি বিদ্রোহী সিপাহীদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে না পারিয়া ‘রেসিডেন্সির’ মধ্যে স্থানীয় ইংরাজ, দেশীয় খৃষ্টান ও কয়েকটি অনুগত সিপাহীসহ অবরুদ্ধ রহিলেন। কানপুরে নানা সাহেব সিপাহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথাকার ইংরাজ সৈন্য সিপাহীদের নিকট আত্মসমর্পন করিল। সিপাহীরা কানপুর অধিকার করিয়া লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড করিল। কেবল উত্তর ভারতেই


বাহাদুর শাহ


নানাসাহেব

নয়, মধ্যভারতে ও বুন্দেলখণ্ডেও সিপাহীদের বিদ্রোহ ইংরাজদের বিপন্ন করে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ঝান্সিতে সিপাহীরা বিদ্রোহী হয় এবং ইউরোপীয় স্ত্রীপুরুষ ও শিশুদের হত্যা করে। পরলোকগত রাজা গঙ্গাধর রাওএর বিধবা পত্নী লক্ষ্মীবাঈকে বিদ্রোহীরা ঝান্সির রাণী বলিয়া ঘোষণা করে।

শিখসৈন্য, কাশ্মীর ও নেপাল রাজ্য, সিন্ধিয়া, নিজাম ও ভুপাল ইংরাজদের পক্ষে থাকায়, ও বোম্বাই, রাজপুতানা ও দক্ষিণভারত শান্ত থাকায় ইংরাজরা অল্পকালের মধ্যেই বিদ্রোহ দমন করিতে পারে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইংরাজরা দিল্লী পুনরুদ্ধার করে। জেনারেল হ্যাভেলক্ কানপুর হইতে নানা সাহেবকে বিতাড়িত করিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে স্যার কলিন্ ক্যাম্পবেল লক্ষ্ণৌ পুনরুদ্ধার করিলেন। ইংরাজ সৈন্য ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ঝান্সি দখল করে। তাঁতিয়া টোপীর অধীনে একদল সৈন্য লক্ষ্মীবাঈকে সাহায্য করিতেছিল। লক্ষ্মীবাঈ ও তাঁতিয়া টোপী পশ্চাদপসরণ করিয়া গোয়ালিয়র দখল করিলেন এবং নানা সাহেবকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সিন্ধিয়া আগ্রায় পলাইয়া গেলেন। তখন ইংরাজরা গোয়ালিয়র দখল করিবার জন্য অগ্রসর হইল। পুরুষের পরিচ্ছদে যুদ্ধ করিতে করিতে রাণী লক্ষ্মীবাঈ রণক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন ও তাঁতিয়া টোপী প্রাণরক্ষার জন্য পলায়ন করিলেন। গোয়ালিয়র ইংরাজদের হস্তগত হইল (২০ শে জুন ১৮৫৮)।



লক্ষ্মীবাঈ

বিদ্রোহের অগ্নি নির্বাপিত হইতে কিঞ্চিত সময় লাগিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে শান্তি স্থাপিত হইল। নানা সাহেব নেপাল রাজ্যের সীমানায় তরাই অঞ্চলে পলায়ন করিলেন। তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল না। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের

এপ্রিল মাসে তাঁতিয়া টোপী ধরা পড়িলেন। কানপুরের হত্যাকাণ্ডে অংশ-গ্রহণের অভিযোগে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হইল। বাহাদুর শাহ রেঙ্গুনে নির্বাসিত হইলেন। সাধারণ বিদ্রোহীদের লর্ড ক্যানিং ক্ষমা করিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের ফলাফল

(সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ভারতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান হইল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর মহারাণী ভিক্টোরিয়া ঘোষণা করিলেন যে তিনি স্বয়ং ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নামে একজন সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্ পনের জন সদস্যযুক্ত একটি কাউন্সিলের সাহায্যে ভারত শাসন করিবেন। এ যাবৎ বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোলের প্রেসিডেণ্টই ভারত শাসনের প্রকৃত কাজ চালাইতেছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার একজন সদস্য ছিলেন। অতএব এই ব্যবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হইল না। গভর্ণর জেনারেল ভারতে মহারাণীর প্রতিনিধি হিসাবে থাকিবেন, অতএব তাঁহার উপাধি হইল ভাইস্‌রয় (Viceroy)। বড়লাট লর্ড ক্যানিং প্রথম ভাইস্‌রয় হইলেন। মহারাণী জানাইলেন যে সম্রাজ্য বিস্তারের ইচ্ছা তাঁহার নাই। কোম্পানীর সহিত ভারতীয় রাজন্যবর্গ যে সকল সন্ধি সর্তে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি সে সকল স্বীকার করিয়া লইলেন। রাজন্য-বর্গের অধিকার, সম্মান ও গৌরব তিনি রক্ষা করিতে অঙ্গীকার করিলেন। জনসাধারণকে মহারাণী অভয় দিলেন যে কাহারও ধর্মবিশ্বাসে বা ধর্মআচরণে হস্তক্ষেপ করা হইবে না।



লর্ড ক্যানিং

তিনি আরও বলিলেন যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে কেবলমাত্র যোগ্যতা অনুসারে রাজকার্য্যে তাঁহার প্রজাদের নিযুক্ত করা হইবে। যাহারা হত্যাকারী হিসাবে দণ্ডিত হইবে তাহাদের ব্যতিরিকে তিনি সকল বিদ্রাহীদের ক্ষমা করিলেন। যে সকল কারণে সিপাহী বিদ্রোহ হয় সেইগুলি দূরীকরণ করাই ছিল এই ঘোষণা পত্রের উদ্দেশ্য। ভারতীয় সৈন্যদল সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠিত হইল এবং সৈন্যদলে ইংরাজদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। গোলন্দাজ বাহিনী ইউরোপীয়দের অধীনে রাখা হইল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং স্বত্ববিলোপ নীতি বর্জন করা হইল বলিয়া ঘোষণা করেন এবং দত্তকপুত্রও সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবে বলিয়া জানান।

সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত ভারতের শাসনব্যবস্থা পুরাতন মোগল শাসন পদ্ধতির ক্রমবর্দ্ধিত রূপমাত্র। সিপাহী বিদ্রোহের প্রচণ্ড আঘাতে যাহা জীর্ণ ও পুরাতন তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল ও নবভারতের জন্ম হইল।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে পুরাতন সুপ্রীম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালতের পরিবর্তে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। অদ্যাবধি এই সময়ের বিচার ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রহিয়াছে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় কাউন্সিল আইন (Indian Councils Act) প্রবর্তিত হয়। এই আইনের দ্বারা বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী সদস্য মনোয়নের ব্যবস্থা হয়। ভারতীয়দের সাহায্যে ভারত শাসনের ইহাই হয় প্রথম সোপান। সাম্রাজ্য পরিচালনার ব্যয় ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছিল। তদুপরি সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্য সরকারের তহবিলে প্রচুর ঘাটতি হয়। এই ঘাটতি পূরণের জন্যই লর্ড ক্যানিং এর শাসনকালে ভারতে প্রথম আয়করের প্রবর্তন হয়। এই সময় অর্থদপ্তরেরও সংস্কার হয়। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার ও দ্রুত যাতায়াতের ব্যবস্থা করার আবশ্যকতা বৃটিশ সরকারের নিকট সুস্পষ্ট হয়। সিপাহী বিদ্রোহের আরম্ভে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ হইতে সামান্য দূর পর্যন্ত রেল লাইন ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর দ্রুত রেলপথের বৃদ্ধি হয়। যে বৎসর সিপাহী বিদ্রোহ হয় সেই বৎসরেই

কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন নবভারতের জন্মের নিদর্শন। ইহার ফলে পশ্চিমের জ্ঞানভাণ্ডার ভারতীয়দের নিকট উন্মুক্ত হয় এবং ভারতীয়দের মনে আত্মমর্য্যাদা ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়।)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভারতে জাতীয় আন্দোলনের উৎপত্তি

লর্ড এল্‌গিন্ (১৮৬২—৬৪ খৃঃ)

লর্ড ক্যানিং এর পর লর্ড এল্‌গিন্ ভাইস্‌রয় নিযুক্ত হ'ন। অল্পকাল পরে পাঞ্জাবে ধর্মশালা নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর স্যার জন্ লরেন্স বড়লাট হ'ন।

স্যার জন্ লরেন্স (১৮৬৪—৬৯ খৃঃ)

দীর্ঘকাল ভারতে নানা বিভাগে কাজ করিয়া স্যার জন্ লরেন্স প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। পাঞ্জাব বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে তিনি পাঞ্জাবে বৃটিশ শাসন স্থাপনের ভারপ্রাপ্ত হন। তাঁহার অধীনে পাঞ্জাবের বিশেষ উন্নতি হয়। সিপাহী বিদ্রোহ দমনেও তিনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন।

লরেন্স বৈদেশিক ব্যাপারে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্থানের আমির দোস্ত মহম্মদের মৃত্যু হইলে কাবুলের সিংহাসন লইয়া যে আত্মীয় বিরোধ চলিতে থাকে তিনি তাহাতে কোনও অংশ গ্রহণ করেন নাই। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে যখন দোস্ত মহম্মদের এক পুত্র শের আলী জয়ী হইলেন, তখন স্যার জন্ তাঁহাকে আমীর বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিন্তু ভুটানীদের ব্যাপারে লরেন্স সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিতে পারিলেন না। ভুটানীরা প্রায়ই উত্তর বাংলায় হানা দিত। বৃটিশরা

বহুবার প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু ভুটানীরা কোনও ভ্রুক্ষেপ করিত না। তাহাদের সহিত কথাবার্তা চালাইবার জন্য লর্ড এল্‌গিন্ একজন ইংরাজ দূত প্রেরণ করেন। ভুটানীরা এই দূতকে অপমান করে। ইহার পর লরেন্স ভুটানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ভুটানের সহিত সন্ধি হয়। এই সন্ধির ফলে ইংরাজরা বাংলার উত্তরে হিমালয়ের দক্ষিণ পাদদেশে দৈর্ঘ্যে ১৮০ মাইল ও প্রস্থে ২০ হইতে ৩০ মাইল অঞ্চল প্রাপ্ত হয়। এই অঞ্চল "দুয়ার" নামে পরিচিত। চা গাছের চাষ হওয়াতে এই স্থানটি আজ বাংলার বিশেষ সম্পদ।

লরেন্সের শাসনকালে ভারতে দুইবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ হওয়ায় প্রায় বিশ লক্ষ লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ হয় রাজপুতানা ও বুন্দেলখণ্ডে। এইবার দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সরকার অনেকটা প্রস্তুত ছিল। কাজেই উড়িষ্যার মতন ভয়াবহ ব্যাপার হয় নাই। স্যার জন্ ভারতের কৃষকদের বন্ধু বলিয়া খ্যাত। তাঁহার শাসনকালে কৃষকদের সত্বরক্ষার জন্য আইন বিধিবদ্ধ হয়। লরেন্সের আমলে বহু খাল খননের পরিকল্পনা আরম্ভ হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ভারত ও ইউরোপের মধ্যে প্রথম তার সংযোগ স্থাপিত হয়। স্যার জন্ লরেন্স ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে পর তাঁহাকে লর্ড উপাধিতে ভূষিত করা হয়। আয়রল্যাণ্ডের অভিজাত বংশীয় লর্ড মেয়ো বড়লাট নিযুক্ত হইলেন।

লর্ড মেয়ো (১৮৬৯-১৮৭২ খৃ:)

আফগানিস্থানের আমীর শের আলীর সহিত সৌহার্দ স্থাপনের জন্য লর্ড মেয়ো আম্বালাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং অর্থ ও যুদ্ধের সরঞ্জাম দিতে প্রতিশ্রুত হন। ভারতীয় রাজন্যবর্গের বংশধরদের শিক্ষার জন্য মেয়ো আজমীরে একটি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা মেয়ো কলেজ নামে প্রসিদ্ধ।

আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কয়েকটি সংস্কারের জন্য লর্ড মেয়োর শাসনকাল স্মরণীয়। ভারত সরকারের আয় ও ব্যয়ের সামঞ্জস্য করিবার জন্য তিনি ব্যয় সঙ্কোচও যেমন করেন তেমন লবণ কর ও আয়কর বৃদ্ধি করেন। কেন্দ্রীয়

সরকার প্রাদেশিক সরকারকে বিভিন্ন খাতে খরচের জন্য টাকা ধরিয়া দিত। কোন খাতে খরচ না হইলে উদ্বৃত্ত টাকা কেন্দ্রীয় সরকারকে ফিরাইয়া দিতে হইত। লর্ড মেয়োর সময় হইতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে মোটামুটি টাকা ধরিয়া দিতে লাগিল। কোন খাতে কত খরচ হইবে তাহা স্থির করার ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারকে দেওয়া হইল। ইহাতে অর্থব্যয়ে প্রাদেশিক সরকারের স্বাধীনতা বৃদ্ধি হইল। লর্ড মেয়োর সময়ে ভারতে প্রথম আদমসুমারী হয়। তিনি কৃষি বিভাগ ও বাণিজ্য বিভাগের সৃষ্টি করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র ভারত ভ্রমণে আসেন। ইংলণ্ডের রাজবংশের প্রতিনিধির ইহাই প্রথম ভারতে আগমন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ পরিদর্শনকালে লর্ড মেয়ো একজন বন্দীর দ্বারা নিহত হ'ন। তাঁহার পরবর্ত্তী বড় লাট লর্ড নর্থব্রুক।

লর্ড নর্থব্রুক (১৮৭২-৭৬ খৃঃ)

শের আলি নর্থব্রুকের নিকট রুশদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করিলে নর্থব্রুক ভারত সচিবের উপদেশে সাহায্য দানে অসম্মত হইলেন। কাজেই শের আলি রুশদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে রক্ষণশীল দল ডিস্‌রেলির অধীনে মন্ত্রিসভা গঠন করিলে নূতন পররাষ্ট্রসচিব আফগানিস্থানের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য আদেশ দেন। লর্ড নর্থব্রুকের সহিত এই ব্যাপারে ইংলণ্ডের নূতন গভর্ণমেণ্টের মনোমালিন্য হয়। লর্ড নর্থব্রুক অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি রপ্তানী ও আমদানীর উপর শুল্ক কমাইয়া দিয়াছিলেন। তথাপি ডিস্‌রেলির গভর্ণমেণ্ট লর্ড নর্থব্রুককে ম্যাঞ্চেষ্টারে তৈয়ারী বস্ত্রের উপর আমদানী শুল্ক আদায় সম্পূর্ণ রদ করিতে বলাতে নর্থব্রুক ঘোর আপত্তি করিলেন। এইরূপ মনোমালিন্য হওয়াতে নর্থব্রুক পদত্যাগ করিলেন।

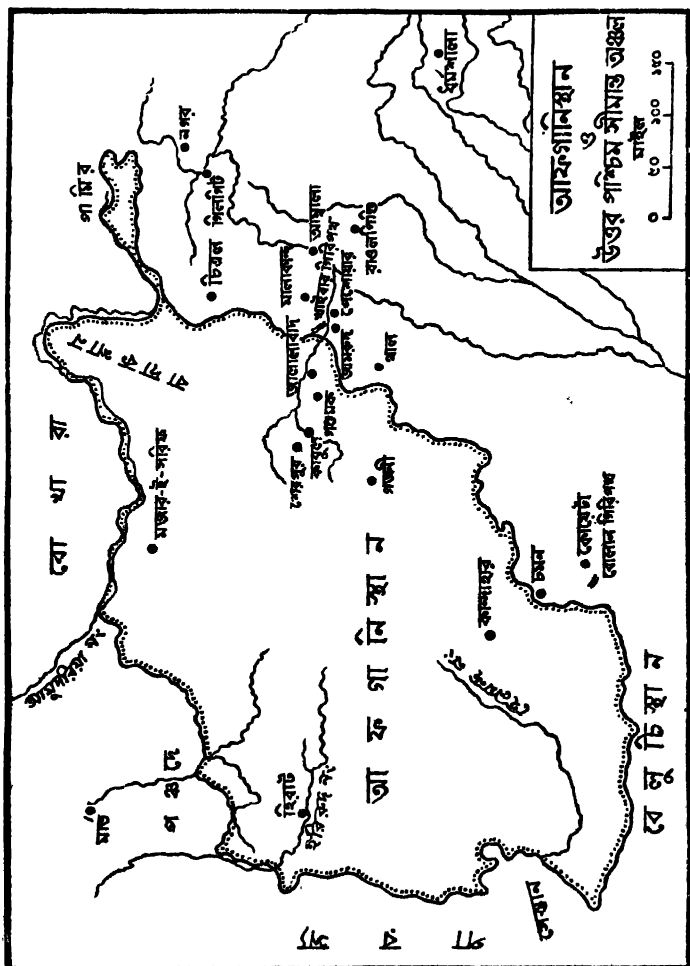
লর্ড লিটন্ (১৮৭৬-১৮৮০ খৃঃ)

ডিস্‌রেলি দ্বিতীয় লর্ড লিটন্‌কে ভাইস্‌রয় নিযুক্ত করিয়া ভারতে পাঠাইলেন। ইনি ছিলেন প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার, স্যার এডওয়ার্ড

বুল্‌ওয়ার লিটনের পুত্র। দ্বিতীয় লর্ড লিটন্‌ও একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ছিলেন। 'ওয়েন মেরেডিথ্‌' বনামে তিনি তাঁহার রচিত কবিতা ও প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করিতেন। ভারতে আসিবার পূর্বে লর্ড লিটন্‌ কুটনৈতিক হিসাবে ইউরোপের বহুদেশে কাজ করেন। শাসন ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু ডিস্‌রেলির মতে তখন ভারতে বড়লাট হিসাবে একজন রাজনীতিজ্ঞ লোকের আবশ্যক ছিল বেশী।

দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ

বহুকাল হইতেই রুশিয়া মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিল। ভারতে ও পৃথিবীর পূর্বাঞ্চলে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য ইংলণ্ডও এই চেষ্টা ব্যর্থ করিতে সর্বদাই ব্যগ্র ছিল। শের আলির রুশদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে ডিস্‌রেলি আতঙ্কিত হইয়াছিলেন। তাঁহারই ইচ্ছানুযায়ী লর্ড লিটন্‌ আফগানিস্থানের ব্যাপারে নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগ করিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিটন্‌ কোয়েটা দখল করিলেন। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এই স্থানটী দখল করাতে ইংরাজরা বোলান গিরিপথের উপর আধিপত্য স্থাপন করিল এবং তাহাদের জন্য কান্দাহারের পথ খোলা রহিল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে শের আলি মহাসমারোহে রুশদূতকে অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু ইংরাজ দূতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। এই কারণে লর্ড লিটন্‌ আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইংরাজরা তিন দিক হইতে আফগানিস্থান আক্রমণ করিল। শের আলি পলায়ন করিয়া রুশিয়ার অশ্রয় লইলেন। লর্ড লিটন্‌ শের আলির পুত্র ইয়াকুব খাঁকে আফগানিস্থানের আমীর বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইয়াকুব খাঁর সহিত ইংরাজদের গণ্ডমুক নামক স্থানে যে সন্ধি হয় তাহাতে স্থির হয় যে পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আফগানিস্থান ভারত সরকারের দ্বারা পরিচালিত হইবে এবং কাবুলে একজন ইংরাজ প্রতিনিধি থাকিবেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে গণ্ডমুকের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। জুলাই মাসে স্যার লুই ক্যাভাগ্‌নারী ইংরাজ প্রতিনিধি হিসাবে কাবুলে আসেন। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি তাঁহার অনুচরসহ আফগানদের হাতে প্রাণ হারাইলেন। লর্ড লিটন্‌


আফগানিস্থান
ও
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল
মাইল
০ ৫০ ১০০ ১৫০
বো খা রা
পা মি র
মার্ভ
প ঞ্জ দে
মজার-ই-সরিফ
চিত্রল
গিলগিট
নগর
হিরাট
হরিরুদ নং
শেরপুর
কাবুল
জালালাবাদ
মালাকন্দ
আম্বালা
খাইবার গিরিপথ
আমরুদ
পেশোয়ার
রাওলপিণ্ডি
থাল
গজনী
আ ফ গা নি স্থা ন
ধর্মশালা
কান্দাহার
চমন
কোয়েটা
বোলান গিরিপথ
সেস্তান
বে লু চি স্থা ন

প্রতিশোধ লইতে বিলম্ব করিলেন না। ইংরাজরা পুনরায় আফগানিস্থান দখল করিল। ইয়াকুব খাঁ ইংরাজদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। ইংরাজরা শের আলির ভ্রাতুষ্পুত্র আবদার রহমানকে আফগানিস্থানের আমীর বলিয়া স্বীকার করিল এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আফগানিস্থানকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুতি দিল। আমীর অবদার রহমান আজীবন ইংরাজদের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করেন।

আভ্যন্তরীন ঘটনাবলী

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের এক আইনের দ্বারা মহারাণী ভিক্টোরিয়া ‘কাইজার-ই-হিন্দ্’ বা ভারত সাম্রাজ্ঞী উপাধিতে ভূষিত হ’ন। ইহা ঘোষণা করিবার জন্য ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী মোগলদের রাজধানী দিল্লীতে মহাসমারোহে এক দরবার হয়। এই দরবারে সকল ভারতীয় রাজন্যবর্গের সমাবেশ হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে অনাবৃষ্টি হওয়ার ফলে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষে কেবল বৃটিশ ভারতেই পঞ্চাশ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মাদ্রাজের গভর্ণর দুর্ভিক্ষ উপশমের জন্য ভুল পন্থা অনুসরণ করাতে সেথায় বহু অর্থ ব্যয় সত্বেও মৃত্যুর হার কমাইতে পারেন নাই। দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনের জন্য ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিটন্ একটি দুর্ভিক্ষ কমিশন (Famine Commission) নিযুক্ত করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টই বর্তমান কালের দুর্ভিক্ষ প্রতিকার নীতির ভিত্তি স্থাপন করে।

মধ্যপ্রাচ্যে রুশ অগ্রগতিতে উৎফুল্ল হইয়া ভারতের কয়েকটী দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ রাজদ্রোহাত্মক রচনা বাহির করিতে লাগিলেন। এই কারণে লর্ড লিটন্ এই জাতীয় সংবাদ পত্রের মালিকদের সরকারের নিকট কিছু টাকা জমা রাখিতে বাধ্য করার জন্য আইন প্রণয়ন করেন। এই আইন Vernacular Press Act নামে পরিচিত। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বিলাতে মন্ত্রি সভার পরিবর্তন হয় এবং ডিস্‌রেলির স্থলে গ্ল্যাড্‌ষ্টোন প্রধান মন্ত্রী হ’ন। ফলে লর্ড লিটন্ পদত্যাগ করিলেন এবং লর্ড রিপন ভাইস্‌রয় নিযুক্ত হইলেন।

লর্ড রিপন (১৮৮০-১৮৮৪ খৃঃ)

আফগানিস্থানে শান্তি স্থাপনের পূর্বেই লর্ড লিটন্ পদত্যাগ করেন। লর্ড রিপন আবদার রহমানকে আমীর বলিয়া স্বীকার করেন এবং আবদার রহমান ইংরাজ ব্যতিরেকে অন্য কোনও বৈদেশিক শক্তির সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন না বলিয়া স্বীকৃত হন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপন মহীশূর রাজ্যের শাসনভার পুনরায় তথাকার ওদেয়ার রাজবংশের হস্তে অর্পণ করেন।

লর্ড রিপন গ্ল্যাড্ষ্টোনের শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহারই ন্যায় উদারপন্থী ছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে ভারতীয়দের মনে নিজেদের দেশের শাসন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা জাগ্রত হয়। এই বিষয়ে লর্ড রিপন ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ভারত শাসন ব্যাপারে তিনি যে উদারনীতি অনুসরণ করেন তাহার ফলে তিনি ভারতীয়দের শ্রদ্ধা অর্জন করেন এবং ইতিহাসে তিনি 'ভারত বন্ধু' নামে পরিচিত। স্থানীয় প্রতিষ্ঠান-গুলি স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে গঠন করিয়া তিনি ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকারের যোগ্য করিয়া তোলেন। পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলির সভ্যগণ সরকারের দ্বারা মনোনীত হইতেন এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটই সভাপতি থাকিতেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপন সিদ্ধান্ত করেন যে পৌর শাসন জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হস্তে ন্যস্ত করা হইবে এবং পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলিকে বে-সরকারী সভাপতি নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইবে। এই ভাবে জনসাধারণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজেদের শাসন ব্যাপার পরিচালনা করিবার শিক্ষালাভ করিবে। তিনি বলেন যে পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের এলাকার মধ্যে শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যরক্ষা, আলোক ও পানীয় জল সরবরাহ এবং রাস্তা নির্মাণ ও



লর্ড রিপন

মেরামতের কার্য পরিচালনা করিবে। কেবলমাত্র নাগরিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই। উপরোক্ত নীতিতে পরিচালিত প্রত্যেক জেলায় একটী জেলা বোর্ড ও প্রত্যেক মহকুমায় একটী লোকাল বোর্ড স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। এই ভাবে লর্ড রিপন ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ভিত্তি গঠন করেন। লর্ড লিটনের প্রবর্তিত Vernacular Press Act রহিত করিয়াও তিনি ভারতবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেন। ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার অনুসন্ধান ও শিক্ষার দ্রুত উন্নতির উপায় উদ্ভাবনের জন্য লর্ড রিপন মিঃ হাণ্টারের সভাপতিত্বে একটী কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নতি ও সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করে। লর্ড রিপন লর্ড নর্থব্রুকের প্রবর্তিত অবাধ বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রথম কারখানা আইন (Factory Act) বিধিবদ্ধ হয়। সাত হইতে বার বৎসরের শিশুদের নয় ঘণ্টার অধিক কারখানায় কাজ করিতে দেওয়া হইবে না, বিপজ্জনক কলগুলি বেড়ার দ্বারা ভালভাবে বেষ্টিত রাখিতে হইবে এবং কারখানাগুলির জন্য সরকারী পরিদর্শক নিযুক্ত হইবে, এই ব্যবস্থা হয়।

লর্ড রিপনের শাসনকালে ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ যে আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকাশ পায় তাহা ভারতের জাতীয়তাবোধের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে। তৎকালীন ফৌজদারী আইন অনুযায়ী কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ সহর ব্যতীত অন্যত্র কোন ভারতীয় বিচারক কোনও ইউরোপীয় অপরাধীর বিচার করিতে পারিত না। কিন্তু সিভিল সার্ভিসের কয়েকজন ভারতীয় সভ্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা জেলা জজ হইয়াছিলেন। অতএব ভারত গভর্ণমেণ্ট বিচার ক্ষমতার এই জাতিগত বৈষম্য দূর করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ভাইস্‌রয়ের মন্ত্রণা সভার আইন সদস্য সি, পি, ইলবার্ট এই উদ্দেশ্যে একটি আইনের খসড়া উপস্থিত করিলেন। ইউরোপীয়রা ইলবার্টের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করিল। তাহারা লর্ড রিপনকে অপমান করিতেও ছাড়িল না। ফলে, ভারতীয়রাও এই বিলের স্বপক্ষে আন্দোলন চালাইতে লাগিল। ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। অবশেষে

গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাবিত আইনের খসড়া ত্যাগ করিয়া মধ্যপন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল। নুতন বিল অনুযায়ী ব্যবস্থা হইল যে ইউরোপীয় অপরাধীরা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা দায়রা জজের নিকট অভিযুক্ত হইলে,—সেই জজ্ বা ম্যাজিষ্ট্রেট ইউরোপীয় হউন বা দেশীয় হউন, জুরীর সাহায্যে বিচারের জন্ম দাবী করিতে পারিবে। এইরূপ জুরীর অর্ধেক ইউরোপীয় হইবে। অতএব ইউরোপীয়দের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হইল এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রভেদ রহিয়া গেল।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপন পদত্যাগ করিলেন। বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি ভারতবাসীর নিকট হইতে শত শত সম্মান পত্র পাইলেন এবং বোম্বাই পর্যন্ত তাঁহার যাত্রা পথ সহস্র সহস্র লোকের প্রশংসাধ্বনিতে মুখরিত হইল।

লর্ড রিপনের শাসন কালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় ভারতের সকল প্রদেশের প্রতিনিধি লইয়া কলিকাতায় একটি জাতীয় সভার অধিবেশন হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে আহূত এই সভার নাম Indian National Conference। লর্ড রিপনের পদত্যাগের এক বৎসর পর, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে, বোম্বাই শহরে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সর্বপ্রথম অধিবেশন হয়। ইহা হইতে ভারতে জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে রিপনের শাসনকালের গুরুত্ব বুঝিতে পারা যায়।

লর্ড ডাফ্‌রিন্‌ (১৮৮৪-১৮৮৮ খৃঃ)

লর্ড রিপনের পর লর্ড ডাফ্‌রিন্‌ ভাইস্‌রয় নিযুক্ত হন। তাঁহার সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ও পূর্ব সীমান্তে বৈদেশিক ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ রূপ ধারণ করে।

লর্ড রিপনের গভর্ণমেণ্ট রুশিয়ার আমন্ত্রণে রুশিয়া ও আফগানিস্থানের মধ্যে সীমা নির্ধারনের জন্য একটি যুগ্ম কমিশনে যোগ দেয়। লর্ড ডাফ্‌রিন্‌ ভাইস্‌রয় হিসাবে যোগদান করিবার একমাস পূর্বে এই কমিশনের কার্য আরম্ভ হয়। কমিশন নিযুক্ত হওয়াতে রুশ ও আফগান উভয় পক্ষই সীমান্তের নিকট যতখানি সম্ভব ততখানি জমি দখল করিতে আরম্ভ করিল। ইহার ফলে

পঞ্চদে নামক স্থান লইয়া রুশ ও আফগানদের মধ্যে কলহ বাধিল। রুশরা বলপূর্বক পঞ্চদে দখল করিল। এই ঘটনায় ভারতে ও বৃটেনে রুশ ভীতি বৃদ্ধি পাইল এবং বৃটিশরা রুশিয়ার সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। এই সময়ে আফগানিস্থানের আমীর আবদার রহমান লর্ড ডাফ্‌রিনের নিমন্ত্রণে রাওলপিণ্ডিতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি রুশদের পঞ্চদে অধিকারে কিছুই বিচলিত হইলেন না। সীমান্ত ব্যাপারে ছোটখাট যুদ্ধ আফগানরা উপেক্ষার চক্ষে দেখিত। অতএব লর্ড ডাফ্‌রিন্ বিলাতে জানাইলেন যে পঞ্চদের ব্যাপারে যুদ্ধ করার কোন কারণ নাই। সীমান্ত কমিশনের কাজ চলিতে লাগিল, পঞ্চদে রুশিয়ার সীমানার মধ্যে বলিয়া কমিশন স্থির করিল এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সীমান্ত নির্ধারনের কার্য সমাপ্ত হইল। রাওলপিণ্ডিতে সাক্ষাতের ফলে আবদার রহমানের সহিত ভারত গভর্ণমেণ্টের মৈত্রী দৃঢ়তর হয়।

লর্ড ডাফ্‌রিনের সময়ে তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ হয় এবং ব্রহ্মদেশের উত্তরাংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এই যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করা হইয়াছে।

লর্ড ডাফ্‌রিন্ সিন্ধিয়াকে গোয়ালিয়র দুর্গ প্রত্যর্পণ করিয়া উদারতার পরিচয় দেন। তিনি বাংলা, অযোধ্যা ও পাঞ্জাবের জন্য বিভিন্ন প্রজাস্বত্ব আইন প্রবর্তন করেন। তাঁহার শাসনকালে বোম্বাইতে বিখ্যাত ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সর্বপ্রথম অধিবেশন হয়।

লর্ড ল্যান্সডাউন্ (১৮৮৮-৯৪ খৃঃ)

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লর্ড ল্যান্সডাউন্ ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্‌রয়ের পদ গ্রহণ করেন। তিনি সাম্রাজ্য ব্যাপারে "অগ্রসর নীতির" পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মর্টিমার ডুরাণ্ডকে দূত নিযুক্ত করিয়া কাবুলে প্রেরণ করেন। এই দৌত্যের ফলে আফগানিস্থানের দক্ষিণ ও পূর্ব সীমান্ত নির্ধারিত হয়। এই সীমান্ত রেখা Durand Line নামে

পরিচিত। এই সময়ে আফগানিস্থানের আমীরের বৃত্তি বার লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া আঠার লক্ষ টাকা করা হয়।

গিলগিট্ উপত্যকায় দুইটি দুর্গ অধিকার করিয়া লর্ড ল্যান্সডাউন্ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দৃঢ়তর করেন। এই দুইটি দুর্গ অধিকার করাতে হিন্দুকুশ পর্বতের কয়েকটি গিরিপথ বৃটিশদের আয়ত্তে আসে।

মণিপুর রাজ্যের সিংহাসন লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইলে লর্ড ল্যান্সডাউন্ হস্তক্ষেপ করেন। তিনি আসামের চীফ্ কমিশনার কুইন্টন্‌কে বার শত অনুচরসহ মণিপুরে পাঠান। মণিপুরের সেনাপতি তখন সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন। কুইন্টন্ সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করিতে চেষ্টা করাতে মণিপুরীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং কুইন্টন্ ও তাঁহার কয়েকজন অনুচরকে হত্যা করিল। এই ঘটনার পর বৃটিশ সৈন্য মণিপুর দখল করিল এবং সেনাপতিকে প্রাণদণ্ড দিল। মণিপুর রাজবংশের একজন নাবালককে সিংহাসন দান করা হইল। নূতন রাজা প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত একজন বৃটিশ প্রতিনিধি মণিপুর শাসন করে।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বিলাতে কমন্স সভা প্রস্তাব করে যে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা যুগপৎ ইংলণ্ডে ও ভারতে হওয়া উচিত। লর্ড ল্যান্সডাউন্ এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা অনুচিত বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের আইনানুযায়ী ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী সভ্য মনোনয়নের ব্যবস্থা হয়। ভারতবাসী ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে দেশবাসীর দ্বারা নির্বাচিত সভ্য থাকা উচিত এবং উহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা উচিত বলিয়া তাহারা দাবী করিতে লাগিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে এই দাবী শাসনকর্তাদের নিকট উপস্থিত করা হইল। লর্ড ডাফ্‌রিন্ এই দাবী অন্ততঃ আংশিকভাবে মিটান উচিত বলিয়া বিলাতে গভর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ করেন। ইহারই ফলে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন সেক্রেটারী অফ্ স্টেট্ লর্ড ক্রস এর Indian Councils Act বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে। কিন্তু

কংগ্রেস যে পরিমাণে সংখ্যা বৃদ্ধি আশা করিয়াছিল সে পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইল না। এই আইনে প্রতিনিধি নির্বাচনের নীতি স্বীকৃত হইল, কিন্তু তাহারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত না হইয়া পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবে বলিয়া ব্যবস্থা হইল। মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড, বণিক প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে আসন দেওয়া হইল এবং প্রাদেশিক সভাগুলির বে-সরকারী সভ্যগণ কর্তৃক মনোনীত চারিজন সভ্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় গ্রহণ করা হইল। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের বার্ষিক আয়ব্যয়ের খসড়া আলোচনা করার ও গভর্ণমেণ্টকে শাসন ব্যাপারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার অধিকার দেওয়া হইল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের আইন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দাবী মিটাইতে পারে নাই, তথাপি নির্বাচনের নীতি স্বীকার করিয়া ও ব্যবস্থাপক সভাতে সরকারের কার্যাবলীর আলোচনার সুযোগ দিয়া ভবিষ্যতে ভারতীয়দের শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে ক্ষমতালাভের পথ উন্মুক্ত করিল।

দ্বিতীয় লর্ড এল্‌গিন্ (১৮৯৪—১৮৯৯ খৃঃ)

লর্ড ল্যান্সডাউন্ এর পর দ্বিতীয় লর্ড এল্‌গিন্ গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হ'ন। তাঁহার পিতা লর্ড এল্‌গিন্ ক্যানিং এর পরে কিছুকাল ভারতের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন। তাঁহার শাসন কালে আফগানিস্থানের সীমান্ত নির্ধারণ কার্য সম্পূর্ণ হয় এবং ব্রহ্মদেশ ও চীন এবং শ্যামের মধ্যেও সীমান্ত রেখা নির্দিষ্ট হয়। গিলগিটের পশ্চিমে পর্বতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত চিত্রাল নামক ছোট একটি রাজ্যের ব্যাপারে কিছুকাল এক পাঠান উপজাতির সহিত যুদ্ধ হয়। আফ্রিদিরা খাইবার গিরিপথ বন্ধ করিয়া দিলে তাহাদের দমন করিবার জন্যও যুদ্ধ হয়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশে প্লেগ আরম্ভ হয় এবং ক্রমে অন্য প্রদেশেও এই রোগ দেখা দেয়। সরকার প্লেগ নিবারণের পন্থা অবলম্বন করাতে দেশীয় সংবাদ পত্রে তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হইতে থাকে এবং পুণাতে দুইজন সরকারী কর্মচারী নিহত হয়। বোম্বাইতে এই ব্যাপার লইয়া দাঙ্গা হয়। ১৮৯৬ ও ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ

দেখা দেয় এবং প্রায় ৭০ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইর সেনাবাহিনী পৃথক ও স্বাধীন ছিল। ঐ বৎসর ভারতের সামরিক সংস্থাগুলি একজন প্রধান সেনাপতির অধীনে কেন্দ্রীভূত করা হয়।

লর্ড কার্জন (১৮৯৯—১৯০৫ খৃঃ)

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন ভাইস্‌রয় ও গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। এই পদ অধিকারের জন্য তাঁহার বিশেষ যোগ্যতা ছিল। গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইবার পূর্বে তিনি কয়েকবার ভারতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তিনি বিলাতে ইণ্ডিয়া অফিসে এক বৎসর এবং পররাষ্ট্র দপ্তরে তিন বৎসর কাজ করিয়াছিলেন। এশিয়ার নানা দেশে তিনি ভ্রমণ করিয়া ছিলেন এবং সেইসকল দেশ সংক্রান্ত সমস্যার বিষয়ে গভীর চিন্তা করিয়া তিনি কয়েকটী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল দেশের শাসন কর্তাদের সহিত তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় ছিল। অতএব ভারত সম্বন্ধে ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তিনি অনেক গুণেরও অধিকারী ছিলেন। তিনি বিদ্বান, বাক্‌পটু, আত্মবিশ্বাসী ও কঠোর পরিশ্রমপ্রিয় ছিলেন। কর্মচারীদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া তিনি স্বয়ং সকল রাজকার্য তত্ত্বাবধান করিতেন। দুই একজন ব্যতিরেকে জ্ঞানে ও গুণে তাঁহার



লর্ড কার্জন

সমকক্ষ গভর্ণর জেনারেল ভারতে আসেন নাই। তথাপি তিনি ভারতে জনপ্রিয় হইতে পারেন নাই। ইহার কারণ তিনি দাম্ভিক ছিলেন এবং ভারতীয়দের

রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল না। লর্ড ডালহৌসির ন্যায় অতি দ্রুত তিনি বহু পরিবর্তন করেন এবং ডালহৌসির ন্যায় লর্ড কার্জনের পদত্যাগের পর ভারতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অশান্তি দেখা দেয়।

বৈদেশিক নীতি : উত্তর পশ্চিম সীমান্ত

লর্ড কার্জন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অগ্রসর নীতি পরিত্যাগ করিয়া অপসারণ ও সংহতি নীতি গ্রহণ করেন। তিনি ভারতে আসিয়া দেখিলেন যে সীমান্তের পরপারে প্রায় দশ হাজার বৃটিশ সৈন্য রহিয়াছে। তিনি উপজাতি অঞ্চলে কিছু সৈন্য রাখিয়া অধিকাংশ সৈন্য অপসারিত করিলেন। অপসারিত বৃটিশ সৈন্যের স্থলে তিনি বৃটিশ সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে উপজাতিয় সৈন্যদল রাখিলেন। উপজাতি দলগুলিকে অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট ও শান্ত রাখার নীতি তিনি অনুসরণ করেন। যাহা হউক, তিনি চিত্রাল রাজ্যের উপর অধিকার ত্যাগ করিলেন না এবং পেশোয়ার ও চিত্রালের মধ্যে রাস্তা নির্মাণ কার্য চলিতে লাগিল। সৈন্য চলাচলের সুবিধার জন্য খাইবার গিরিপথ পর্যন্ত এবং কুরাম উপত্যকার প্রান্ত পর্যন্ত রেলপথ নির্মিত হইল।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের জেলাগুলি পাঞ্জাবের লেফ্টেনাণ্ট গভর্ণরের অধীনে ছিল। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন সিন্ধু নদীর পশ্চিমে চল্লিশ হাজার বর্গমাইল লইয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঠন করিলেন এবং এই প্রদেশের শাসনভার ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ অধীনে একজন চীফ্ কমিশনারের উপর ন্যস্ত হইল। এই ভাবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন হইল। নূতন প্রদেশের রাজধানী হইল পেশোয়ার।

আফ্গানিস্থান

১৯০১ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে আফ্গানিস্থানের আমীর আবদার রহমানের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র হবিবুল্লা কাবুলের সিংহাসন আরোহণ করিলেন। লর্ড কার্জন হবিবুল্লার সহিত নূতন সন্ধি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হবিবুল্লা বলিলেন যে তাঁহার পিতার সহিত ইংরাজদের যে সন্ধি হইয়াছে তাহা বলবৎ রহিয়াছে, অতএব নূতন কোন সন্ধির আবশ্যক নাই। এই ব্যাপারে

ইঙ্গ-আফ্গান সম্পর্ক তিক্ত হইয়া পড়ে এবং হবিবুল্লা বৃটিশদের অর্থ সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন কয়েক মাসের জন্য বিলাতে যান এবং লর্ড অ্যাম্প্‌ট্‌হিল অস্থায়ী বড়লাট হন। লর্ড অ্যাম্প্‌ট্‌হিল স্যার লুই ডেনকে দূত নিযুক্ত করিয়া কাবুলে প্রেরণ করেন। এই দৌত্যের ফলে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে হবিবুল্লার সহিত সন্ধি হয়। আবদার রহমানের সহিত বৃটিশদের যে সকল সর্ত হইয়াছিল এই সন্ধিতে তাহারই পুনরাবৃত্তি করা হইল এবং হবিবুল্লা স্বাধীন নরপতি বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। ইহার পর হবিবুল্লা ইংরাজদের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিলেন।

পারস্য উপসাগর

মধ্যপ্রাচ্যে ও পারস্য উপসাগর অঞ্চলে বৃটিশরা সর্বদাই নিজেদের রাজনৈতিক ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় স্বার্থরক্ষার জন্য সজাগ থাকিত। লর্ড কার্জনের সময়ে তুরস্ক, ফ্রান্স, রুশিয়া, জার্মানী প্রত্যেকেই এই অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিল। বিশেষতঃ উত্তর পারস্যে রুশদের প্রভাব বৃটিশদের চিন্তার কারণ হইয়া পড়িল।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন স্বয়ং পারস্য উপসাগর অঞ্চলে গিয়া বৃটিশদের স্বার্থরক্ষার জন্য কয়েকটী ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। পারস্য উপসাগরের বন্দরগুলিতে এবং পারস্যের অভ্যন্তরে কয়েকটী বাণিজ্য কেন্দ্রে বৃটিশ প্রতিনিধি রাখা হইল। কোয়েটা হইতে নুস্‌কী পর্যন্ত রেলপথ স্থাপিত হইল এবং নুস্‌কী হইতে পারস্য সীমান্ত পর্যন্ত রাস্তা নির্মিত হইল।

তিব্বত

বহুদিন যাবৎ তিব্বতের সহিত ভারত গভর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ বিশেষ ভাল ছিল না। লর্ড কার্জনের সময়ে উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হইল। একজন রুশ দূত তিব্বতে অভ্যর্থনা পাইল, কিন্তু তিব্বতের লামা লর্ড কার্জনের পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। বৃটিশদের রুশভীতি জাগ্রত হইল এবং লর্ড কার্জন তিব্বতের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বৃটিশরা তিব্বতের রাজধানী লাসা দখল করিল। তিব্বত ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ ইংরাজদের কিছু অর্থ দিল এবং কয়েকটি কেন্দ্রে ব্যবসায় করিবার

অনুমতি দিল। তিব্বত হইতে রুশ প্রভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশরা ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে চীনদের সহিত একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিল। ব্যবস্থা হইল যে বৃটেন তিব্বতের কোনও অংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে পারিবে না এবং তিব্বতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না। চীন সরকার অপর কোনও বৈদেশিক শক্তিকে তিব্বত দখল করিতে দিবে না, কিম্বা তিব্বতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে দিবে না বলিয়া স্বীকৃত হইল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরা রুশদের সহিত চুক্তি করিল যে চীন সাম্রাজ্যের মাধ্যমে তাহারা তিব্বতের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করিবে। এই ভাবে তিব্বতের উপর চীন দেশের আধিপত্য স্বীকৃত হইল। কয়েক বৎসরের পর চীনদেশে অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হয় এবং ইহার সুযোগে তিব্বত পুনরায় সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়।

লর্ড কার্জনের সময়ে ভারতীয় সৈন্য চীনদেশে, সোমালিল্যাণ্ডে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃটিশ স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রেরিত হয়।

আভ্যন্তরীণ নীতি

লর্ড কার্জনের শাসনকালের প্রারম্ভেই ভারতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ গুজরাটে সর্বাপেক্ষা বেশী দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষ উপশমের জন্য লর্ড কার্জন প্রাণপণ চেষ্টা করেন। একটি দুর্ভিক্ষ কমিশন নিযুক্ত করা হয় এবং এই কমিশন ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তাহাদের রিপোর্ট দাখিল করে।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদের নিজাম বেরার প্রদেশ ইংরাজদের হস্তে সমর্পন করিলেন। ইহার পরিবর্তে নিজাম বার্ষিক নির্দিষ্ট অর্থ পাইবেন বলিয়া ব্যবস্থা হইল।

লর্ড কার্জন প্রায় প্রত্যেক শাসন বিভাগ সংস্কার করেন। বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মপদ্ধতি অনুসন্ধান করিবার জন্য তিনি বিভিন্ন কমিটি নিযুক্ত করেন এবং এই কমিটিগুলির সুপারিশ অবলম্বনে তিনি আবশ্যকীয় সংস্কারের ব্যবস্থা করেন। পুলিশ বিভাগ, কৃষি বিভাগ, সৈন্য বিভাগ, রেল বিভাগ, শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ সকলই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষন করে। শিক্ষার ব্যাপারেও তিনি সংশোধিত ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করেন।

পুলিশ বিভাগের কার্য অনুসন্ধান করিবার জন্য নিযুক্ত কমিশন ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ঐ বিভাগের তীব্র নিন্দা করিয়া রিপোর্ট পেশ করে। তাহাদের সুপারিশ অনুযায়ী পুলিশ বিভাগে কতকগুলি পরিবর্তন করা হয়। ভূমি রাজস্ব আদায়ের কঠোরতা হ্রাস ও কৃষকদের অবস্থা উন্নতি করিবার জন্য তিনি কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। অর্থাভাবে কৃষকরা জমি বন্ধক দিয়া মহাজনের নিকট অত্যন্ত বেশী সুদে টাকা ধার লইত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা টাকা শোধ দিতে পারিত না এবং তাহাদের জমি মহাজনের হাতে চলিয়া যাইত। লর্ড কার্জন পাঞ্জাবের জন্য ভূমি হস্তান্তর আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই আইনের বলে কৃষকদের জমি ঋণের দায়ে বিক্রীত হইতে পারিত না। যাহাতে কৃষকরা অল্প সুদে টাকা ধার পায় তজ্জন্য সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপিত হইল। কৃষির উন্নতির জন্য লর্ড কার্জন সর্বভারতীয় কৃষি বিভাগ স্থাপন করেন। এই বিভাগের অধীনে গবেষণাগার ও পরীক্ষা-মূলক কৃষিকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এই সকল কার্যের ভার একজন কৃষিদপ্তরের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলের হস্তে অর্পন করা হয়। রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য লর্ড কার্জন বহু অর্থ মঞ্জুর করেন এবং ছয় হাজার মাইল নূতন রেলপথ খোলা হয়। লর্ড কার্জন ১৯০১ খৃষ্টাব্দে একটি সেচ কমিশন নিযুক্ত করেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ইহারা ভবিষ্যৎ বিশ বৎসরের কার্যসূচী পেশ করে। তাহাদের পরিকল্পনায় ৬৫ লক্ষ একর জমি সেচ করার ব্যবস্থা ছিল। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য লর্ড কার্জন একটি শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ স্থাপন করেন। দরিদ্রদের সুবিধার জন্য তিনি লবণ কর হ্রাস করেন। লর্ড কার্জন প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করেন। এই আইন দ্বারা ঐতিহাসিক কীর্তি চিহ্ন রক্ষা করার ব্যবস্থা হয়। ভারতীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের যুবকদিগকে লইয়া তিনি ইম্পিরিয়াল কেডেট কোরস্‌ গঠন করেন।

শিক্ষার অবস্থাও লর্ড কার্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কি ভাবে উন্নতি করা যাইতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবনের জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে এই কমিশনের

রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একটি আইন (Universities Act of 1904) বিধিবদ্ধ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে আরও অধিক মাত্রায় সরকারের আয়ত্তাধীন করা হয়। এই আইনের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণের সংস্থা মাত্র ছিল। নূতন আইনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উচ্চতর কর্তব্য রহিয়াছে বলিয়া স্বীকৃত হইল। তাহাদের অধ্যাপক নিয়োগ, উচ্চশিক্ষা দান ও গবেষণাগার স্থাপনের জন্য ক্ষমতা দেওয়া হইল। এই আইনের বলেই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগ গঠন করেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী সপ্তম এড্ওয়ার্ডকে ভারত সম্রাট ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে দিল্লিতে মহাসমারোহে একটি দরবার অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক ভারতীয় নরপতি এই দরবারে উপস্থিত হন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে লর্ড কার্জন স্বদেশে গমন করেন এবং ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে ভারতে ফিরিয়া আসেন। ভারতে পুনরাগমনের পর তিনি বাংলার শাসন ব্যাপারে যে পরিবর্তন করেন তাহার ফলে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

সেকালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা লেফ্টেনেণ্ট গভর্ণর শাসিত একটি প্রদেশ ছিল। একজনের পক্ষে এই বিশাল প্রদেশের শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। একটি অনুসন্ধান কমিটি তাহাদের রিপোর্টে বলে যে পূর্ববঙ্গে যে অরাজক অবস্থা তাহাতে লোকের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষা হইতেছে না। তখন আসাম একজন হাই-কমিশনার শাসিত অঞ্চল ছিল। লর্ড কার্জন চট্টগ্রাম ও পূর্ব বাংলার সহিত আসামকে সংযুক্ত করিয়া পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি প্রদেশ গঠন করিলেন। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা লইয়া একটি প্রদেশ গঠিত হইল। এই প্রদেশের নাম হইল বঙ্গদেশ। এই পরিবর্তনের প্রস্তাবে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই ধারণা হইল যে বাঙ্গালী জাতিকে বিভক্ত করিয়া তাহাদের ঐতিহ্য ও কৃষ্টি নষ্ট করাই এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ দেশনায়কগণ এই

আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন বাংলার সীমা ছাড়াইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই আন্দোলন এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল।

সামরিক বিভাগের শাসন ক্ষমতা লইয়া লর্ড কার্জনের সহিত প্রধান সেনাপতির মতভেদ হইলে ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভা প্রধান সেনাপতিকে সমর্থন করে। লর্ড কার্জন এই কারণে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে পদত্যাগ করেন।

ভারতে জাতীয়তাবোধের উৎপত্তি

ভারতের জাতীয়তাবোধের উৎস অনুসন্ধান করিতে গেলে আমাদের ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট পর্য্যন্ত যাইতে হয়। এই চার্টার অ্যাক্টে ইংরাজরা ভারতীয়দের শিক্ষা দানের দায়িত্ব স্বীকার করে। ক্রমশঃ পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্রুত প্রসার হইতে থাকে। শিক্ষিত ভারতীয়রা পাশ্চাত্য জগতের স্বাধীন চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হয়। ইংলণ্ডে জনগণ কি ভাবে রাজার নিকট হইতে রাজনৈতিক অধিকার আদায় করে এবং ইংলণ্ডে কি ভাবে গণতন্ত্রমূলক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় সে বিষয়ে শিক্ষিত ভারতীয় মাত্রেই জানিতে পারে। ইউরোপীয় উদারপন্থী লেখকদের গ্রন্থাদি তাহারা পাঠ করে। এই ভাবে নিজেদের দেশের শাসন ব্যাপারে অংশগ্রহণ করিবার ইচ্ছা তাহাদের মনে জাগ্রত হয় এবং ইহা তাহাদের ন্যায্য দাবী বলিয়া শাসকদের নিকট জানাইতে আরম্ভ করে। ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক একই ভাষার মাধ্যমে আলাপ আলোচনা চালাইতে পারে। ক্রমশঃ সমগ্র ভারত একই রাজশক্তির অধীনস্থ হয়। কেন্দ্রীভূত রাজশক্তি ও ইংরাজী ভাষা ভারতকে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ করে। শিক্ষিত লোকেরা নিজেদের ভারতীয় বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করে এবং তাহাদের মধ্যে নূতন আত্মমর্যাদার সৃষ্টি হয়। রাজা রামমোহন রায় তাহাদের মনে জাতীয়তা বোধ জাগ্রত করেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রেল লাইন, ডাক ও টেলিগ্রাফের প্রবর্তনের ফলে ভারতের এক প্রদেশের লোকের সহিত অন্য

প্রদেশের লোকের সংযোগ স্থাপনের সুবিধা হয়। অতএব সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ভারতীয়দের শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের স্বাভাবিক দাবী জানাইবার জন্য সংস্থা গঠন করা সম্ভব হয়।

শিক্ষিত ভারতীয়রা প্রথমে মাত্র সরকারের উচ্চপদগুলিতে অধিকতর সংখ্যায় নিয়োজিত হইবার জন্য ব্যগ্র হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দে বলা হইল যে ভারতীয়দের কোম্পানীর অধীনে যে কোনও পদ অধিকার করাতে বাধা থাকিবে না। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায় এই কথার পুনরাবৃত্তি হইল। কিন্তু ইংরাজরা এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিল না। ফলে শিক্ষিত ভারতীয়রা ক্ষুব্ধ হইল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য হইলেন, কিন্তু সামান্য কারণে তাঁহাকে চাকুরী দেওয়া হইল না। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া সুরেন্দ্রনাথ রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় "Indian Association" স্থাপন করিলেন। ভারতীয়দের দাবীর সম্বন্ধে জনমত গঠন এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার বয়স ২১ হইতে কমাইয়া ১৯ বৎসর করা হইল। এত অল্প বয়সে ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে বিলাতে গিয়া ইংরাজী ভাষায় প্রশ্নোত্তর করিয়া ইংরাজ পরীক্ষার্থীদের সহিত প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য্য হওয়া সহজ সাধ্য নহে, অতএব ভারতীয়দের সিভিল সার্ভিসে প্রবেশের বাধা দিবার জন্যই যে নিয়ম পরিবর্তন করা হইয়াছে, এই ধারণা ভারতীয়দের মধ্যে বদ্ধমূল হইল। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই নিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য কলিকাতায় একটী জনসভা হইল। সুরেন্দ্রনাথ



সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বারানসী হইতে লাহোর পর্যন্ত নানা শহরে এইরূপ সভা আহ্বান করিয়া তাঁহার অসাধারণ বাগ্মীতার পরিচয় দিলেন। ভারতের বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের লোক সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য একই সভায় একত্রিত হওয়ার দৃষ্টান্ত এই দেশে এই প্রথম।

ইহার পর লর্ড লিটনের প্রবর্তিত অস্ত্র আইন (Arms Act) এবং দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন (Vernacular Press Act) এর বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়। এইরূপ একের পর এক আন্দোলনের ফলে কেবলমাত্র যে জাতীয়তাবোধ দৃঢ়তর হয় তাহা নয়, শাসনযন্ত্র জনগণের করায়ত্ব হওয়া উচিত এই ধারণাও জাগ্রত হয়। ইলবার্টের প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়দের আন্দোলনের সাফল্যে প্রমাণ হয় যে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করিতে পারিলে গভর্ণমেণ্টকেও মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য করা যায়।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিদের লইয়া কলিকাতায় Indian National Conference এর অধিবেশন হয়। এই বৎসর অ্যালান্ অক্টেভিয়ান হিউম্ নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের ভারতের মানসিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য একটী সংস্থা স্থাপন করিবার উপদেশ দেন। বড়লাট লর্ড ডাফ্রিন্ হিউম্‌কে সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য ভারতীয় জনমত জানা যায় এইরূপ একটী সংস্থার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। ভারতীয় নেতৃবর্গের সহযোগিতায় হিউমের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কলিকাতার বিখ্যাত আইন ব্যবসায়ী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সময় কলিকাতায় Indian National Conference হওয়াতে মাত্র ৭০ জন প্রতিনিধি প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করেন।

ইহার পর প্রতি বৎসরই কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ক্রমে Indian National Conference-এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজদের শাসন নীতির সমালোচনা করা ও শাসন সংস্কারের প্রস্তাব পেশ করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল। এই সময়ে কংগ্রেস সরকারের নিকট যে সকল দাবী জানায় তাহার মধ্যে ছিল—(১) ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের অবসান, (২) আইন সভাগুলির আয়তন বৃদ্ধি ও নির্বাচন নীতির প্রয়োগ, (৩) আইন সভায় সরকারের আয় ব্যয়ের খসড়া আলোচনা করিবার অধিকার, (৪) যুগপৎ বিলাতে ও ভারতবর্ষে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণ, (৫) সামরিক ব্যাপারে ভারতীয় অর্থব্যয় হ্রাস, (৬) ভারতীয়দের সামরিক শিক্ষা দান ও কমিশন প্রাপ্ত অফিসার হিসাবে নিয়োগ।

আমরা দেখিয়াছি যে ইংরাজরা প্রথমে ভারতীয়দের জনমত জ্ঞাপনের জন্য একটী সর্বভারতীয় সংস্থা গঠনে উৎসাহিত করে। প্রথম প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়ে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের বড়লাট ভবনে নিমন্ত্রণ হইত। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ইংরাজরা কংগ্রেসকে কুনজরে দেখিতে লাগিল। তাহারা বলিল যে কংগ্রেস শিক্ষিত ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠান; এই শিক্ষিত ভারতীয়রা দেশের জনসাধারণের মতামত প্রকাশ করিবার যোগ্যতা দাবী করিতে পারে না, কারণ তাহাদের সংখ্যা দেশের মোট লোকসংখ্যার তুলনায় অতি নগন্য। এই অজুহাতে গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের দাবীতে কর্ণপাত করিল না।

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট (১৮৯২ খৃঃ)

ইংরাজরা তাহাদের সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়াছিল দেখিয়া ভারতের নেতৃবর্গের ধারণা হইল যে বিলাতে জনসাধারণের মধ্যে ভারতের আশা আকাঙ্খার সহানুভূতিশীল মনোভাব গঠন করিতে পারিলে ভারতের জন্যও তাহারা তদনুরূপ ব্যবস্থা করিবে। এই উদ্দেশ্যে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে একটী সংস্থা গঠিত হইল এবং 'ইণ্ডিয়া' নামক একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা হইল। ইংলণ্ডে আন্দোলন ফলপ্রসু হইল। বহু শিক্ষিত ইংরাজদের মনে ভারতীয়দের

দাবীর সম্বন্ধে সহানুভূতি জন্মিল। কমন্স সভার সভ্য চার্লস ব্রাড্‌ল ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে যোগদান করেন এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভাগুলির সংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্য কমন্স্ সভায় একটী আইনের খসড়া উপস্থিত করেন। ইহারই পর ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ভারত সচীব লর্ড ক্রস্ তাঁহার প্রস্তাব পেশ করেন এবং Indian Councils Act বিধিবদ্ধ হয়।

তিলক ও চরমপন্থী দল

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের Indian Councils Act ভারতীয় নেতৃবর্গের দাবী মিটাইতে পারিল না। তখন পর্যন্ত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করাই কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কংগ্রেসের অনুসৃত পদ্ধতিতে কোনও ফল না হওয়ায় দেশের মধ্যে এক নূতন দলের উদয় হইল। তাহারা বলিল যে কেবল বক্তৃতা করিয়া এবং কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব সরকারের নিকট পেশ করিয়া কোনই ফল হইবে না। দেশব্যাপী উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া দেশের জনসাধারণের মধ্যে আত্মমর্য্যাদা ও রাজনৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। কংগ্রেসের সহিত ইহাদের যোগসূত্র রহিল, কিন্তু যে দল গোপন ষড়যন্ত্রের দ্বারা অরাজকতার সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিল, ইহারা সেই দলকে পুষ্ট করিল। যাহারা এই সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলন নূতন পথে চালিত করে তাহাদের নেতা ছিলেন একজন মারাঠা ব্রাহ্মণ বালগঙ্গাধর তিলক। তিলক গোঁড়া হিন্দু ছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার কর্মক্ষেত্র ছিল পেশোয়াদের রাজধানী


বালগঙ্গাধর তিলক

পুনা। ইংরাজদের উপর তাঁহার বিদ্বেষের কারণ ছিল যে তাহারা মারাঠাদের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে এবং শুধু তাহাই নহে, তাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন করিয়া হিন্দুদের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করিয়াছে ও তাহাদের পুরাতন কৃষ্টি ধ্বংস করিতেছে। তিনি তাঁহার সহকর্মীদের লইয়া পুনাতে কতকগুলি স্কুল ও কলেজ স্থাপন করেন। তিনি শিবাজীকে জাতীয় আদর্শ রূপে প্রচার করিবার জন্য শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন করেন এবং তাঁহার "কেশরী" পত্রিকার মাধ্যমে তাঁহার রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ জনগণের মধ্যে প্রচার করেন। মারাঠারা অল্পকাল পূর্বে স্বাধীনতা হারাইয়াছিল, কাজেই মহারাষ্ট্র প্রদেশ তিলকের বাণীতে সহজেই উত্তেজিত হইল। সন্ত্রাসবাদীরাও তিলকের বক্তৃতা ও প্রবন্ধে উৎসাহিত হইল। বোম্বাই প্রদেশে প্লেগ দেখা দেওয়াতে গভর্ণমেন্ট প্লেগ নিবারণী যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিল তাহার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করার ফলে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে দুইজন ইংরাজ কর্মচারী নিহত হইল। হত্যাকারীরা ছিল তিলকের প্রতিষ্ঠিত "হিন্দু-ধর্মানুসরণে বাধা অপসারণ সমিতির" সভ্য। তিলককে গ্রেপ্তার করা হইল এবং কিছুকালের জন্য তিনি কারারুদ্ধ হইলেন।

স্বদেশী আন্দোলন

বাংলাদেশেও এক দল শান্তিপূর্ণ পথ ত্যাগ করিয়া শক্তির উপাসনা আরম্ভ করিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহারা বাংলাদেশে কয়েকটি গোপন সমিতি স্থাপন করে। এই দলের পথ প্রদর্শক হইলেন অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০)। বিলাতে শিক্ষার পর তিনি এই সময়ে বরোদা কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন। দেশে যখন এই অবস্থা, লর্ড কার্জন তখন বাংলাকে বিভক্ত করিয়া "পূর্ববঙ্গ ও আসাম" নামে একটি প্রদেশ গঠন করেন। বাংলাদেশে এক অভূতপূর্ব উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। ইংরাজদের অর্থ নৈতিক দিকে আঘাত করিয়া জব্দ করিবার উদ্দেশ্যে বিলাতী পণ্যদ্রব্য বর্জন ও স্বদেশজাত সামগ্রী ব্যবহারের জন্য আন্দোলন আরম্ভ হইল। ইহা "স্বদেশী আন্দোলন" নামে পরিচিত। এই সময়ে (১৯০৫) রুশ-জাপান যুদ্ধে নবজাগ্রত

প্রাচ্যজাতি জাপান জয়ী হওয়াতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মনে নূতন আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হইল। বাংলাদেশে আরম্ভ হইয়া স্বদেশী আন্দোলন সর্বভারতীয় আকার ধারণ করে। স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল, বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজা সুবোধ মল্লিক। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশে কয়েকটী ছোটখাট শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। সরকারের দ্বারা স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয় বয়কটের জন্য Council of National Education গঠন করিয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠানে যুবকদের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয়।



শ্রীঅরবিন্দ

বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ

ভারতে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে বাঙ্গালী লেখক ও ধর্মপ্রচারকদের অবদান অস্বীকার করা অসম্ভব। যে সকল লেখক ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণে সহায়তা করেন তাহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ। স্বদেশকে আরাধ্য দেবতা ভাবে জ্ঞান করিতে তিনি বাঙালীকে শিক্ষা দেন এবং তাঁহার "বন্দে মাতরম" মন্ত্র জাতীয়-সংগ্রামের সৈনিকদের মধ্যে এক নূতন প্রাণ আনিয়া দেয়। অপর ক্ষেত্রে দুইজন বঙ্গসন্তান ভারতীয়দের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করেন এবং জগতের নিকট ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৪-১৮৮৬) সকল ধর্মের মধ্যে একই সত্য নিহিত রহিয়াছে

বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং দেশবাসীকে সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিতে শিক্ষা দেন। তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দকে (১৮৬৩-১৯০২) প্রচার কার্যে নিয়োজিত করেন। বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে স্মরণ করাইয়া দেন যে তাহারা এক জগৎ শ্রেষ্ঠ কৃষ্টি ও সভ্যতার অধিকারী। সেই কথা তাহাদের যেমন বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে তেমনি পাশ্চাত্য সভ্যতার যাহা কিছু উৎকৃষ্ট তাহা গ্রহণ করাও তাহাদের কর্তব্য। তাঁহার দেশবাসীকে তিনি মানবের সেবায় প্রবৃত্ত হইতে ও জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা বর্জন করিতে শিক্ষা দিলেন। এইভাবে তিনি ভারতীয়দের মধ্যে এক নূতন আদর্শ ও নূতন চেতনা জাগ্রত করিলেন। বিদেশে গিয়া তিনি ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার উৎকর্ষ প্রমাণ করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় আমেরিকা ও ইংলণ্ডে ভারতের উপর শ্রদ্ধা জন্মাইল। উত্তরকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহানুভূতি বিবেকানন্দের প্রচারের ফল।


শ্রীরামকৃষ্ণ


বিবেকানন্দ

সুরাট কংগ্রেস ও সন্ত্রাসবাদ

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে গোপালকৃষ্ণ গোখলের সভাপতিত্বে যে কংগ্রেস অধিবেশন হয় তাহাতে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে মতানৈক্যের প্রকাশ পায়। বিপিনচন্দ্র পাল বলেন যে ভারতকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ;

কিন্তু নরমপন্থীরা ব্রিটিশদের অধীনে থাকিয়া স্বায়ত্ত শাসন লাভ করাই নিজেদের আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে দাদাভাই নৌরজী সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি বলেন স্বরাজ বা পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন লাভই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে প্রকাশ্য বিচ্ছেদ হয়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেস নরমপন্থীদের হাতেই রহিয়া গেল। চরমপন্থীরা কংগ্রেসের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে না পারিয়া তাহাদের প্রকাশিত পত্রিকা গুলির মাধ্যমে তাহাদের মত প্রচার করিতে লাগিল। যুবক সম্প্রদায় উত্তেজিত হইয়া সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিল। গোপন সমিতিগুলি ইংরাজদের মারিবার জন্য বোমা তৈয়ারী ও অস্ত্র সংগ্রহ করিতে লাগিল। অর্থের আবশ্যক হইলে যুবকরা ডাকাতি ও লুণ্ঠন করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম বিচারপতি কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে মিসেস কেনেডির প্রাণ লইলেন ; মানিকতলায় বোমার কারখানা বাহির হইল; বাংলায় ছোটলাট ফ্রেসারেরও আহমেদাবাদে বড়লাটের প্রাণ নাশ করিবার চেষ্টা হইল এবং বিলাতে ইণ্ডিয়া অফিসের কার্জন ওয়াইলীকে একটী পাঞ্জাবী যুবক হত্যা করিল। সন্ত্রাসবাদীদের অনেককে ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণ দিতে হইল ; অনেকে কারারুদ্ধ রহিলেন ; কেহ কেহ দ্বীপান্তরে গেলেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রহিত করা হইল। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা পুনরায় মিলিত হইল। বিহার ও উড়িষ্যা লইয়া পৃথক প্রদেশ গঠিত হইল। বাংলার প্রতিপত্তি খর্ব করিবার জন্য ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লী স্থানান্তরিত করা হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি

মুসলিম লীগের জন্ম

বলা বাহুল্য যে কংগ্রেস আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় ভারতের সকল সম্প্রদায় সমান ভাবে যোগদান করে নাই। ইংরাজী শিক্ষিত লোকেরাই এই আন্দোলন চালাইতেছিল। মুসলমানরা ইংরাজদের ঘৃণা করিত বলিয়া ইংরাজী শিক্ষা বরণ না করিয়া তাহাদের মক্তব ও মাদ্রাসাতে আরবী ও ফারসী অনুশীলন করিত। ফলে হিন্দুরাই সরকারী চাকুরী পাইত ও তাহারাই দেশে সম্মানজনক স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই অবস্থায় মুসলমানদের নূতন পথে চালিত করেন যুক্ত প্রদেশের একজন মুসলমান নেতা সৈয়দ আহম্মদ খাঁ। তিনি মুসলমানদের ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে উপদেশ দেন এবং আলিগড়ে অ্যাংলো ওরিয়েণ্টাল কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজ ক্রমে মুসলমানদের ইংরাজী শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হয় এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে অলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। সৈয়দ আহম্মদ্ কংগ্রেস বিরোধী ও বৃটিশ ভক্ত ছিলেন। তিনি বলিলেন যে বৃটেনের শাসন পদ্ধতির অনুকরণে ভারতে স্বায়ত্ত্বশাসনমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় লাভবান হইবে। মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ, অতএব কংগ্রেসের দাবীকে তাহারা সমর্থন করিতে পারে না। এই সময়ে ইংরাজরা কংগ্রেসকে কুনজরে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কংগ্রেসের প্রতি একজন মুসলমান নেতার এইরূপ ভ্রান্ত মনোভাবের মধ্যে তাহারা নিজেদের সুযোগ খুজিয়া পাইল, এবং এই সময় হইতে তাহারা ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহম্মদ United India Patiotic Association স্থাপন করিলেন এবং ভারতে ও ইংলণ্ডে কংগ্রেস বিরোধী প্রচার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কংগ্রেস একটি রাজনৈতিক দল ছিল না; ইহা ছিল সাম্প্রদায়িকতার বহু উর্ধে একটি জাতীয় সংস্থান। বহু মুসলমান নেতা সৈয়দ আহম্মদের সহিত একমত ছিল না। তথাপি ইংরাজদের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া সৈয়দ আহম্মদের

মতাবলম্বীরা সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইতে লাগিল। পুরস্কার স্বরূপ ইংরাজরা সৈয়দ আহম্মদকে আইন সভার সদস্য মনোনীত করিল এবং 'স্যার' উপাধি প্রদান করিল। অবশেষে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী দলরূপে সর্ব-ভারতীয় মুসলীম লীগের জন্ম হইল।

মর্লি-মিণ্টো সংস্কার (১৯০৯ খৃঃ)

ভারতে সন্ত্রাসবাদের উত্তরে ইংরাজরা একদিকে কঠোর দমন নীতি অনুসরণ করে, অপর দিকে ভারতের শাসন ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া একটি নূতন আইন বিধিবদ্ধ করে। ইহা মর্লি-মণ্টো সংস্কার নামে পরিচিত। ভারত সচিব লর্ড মর্লি এবং বড়লাট লর্ড মিণ্টোর (১৯০৫—১৯১০) চেষ্টায় এই সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের আইন ব্যবস্থাপক সভাগুলির গঠন ও ক্ষমতার পরিবর্তন করিল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল ও নির্বাচন নীতি স্পষ্ট ভাবে গ্রহণ করা হইল। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য সংখ্যা ১৬ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৬০ করা হইল। এই ৬০ জনের মধ্যে ২৭ জন নির্বাচিত হইবেন এবং ৩৩ জন মনোনীত হইবেন। মনোনীত সভ্যদের মধ্যে ২৮ জন সরকারী কর্মচারী ও ৫ জন বেসরকারী লোক থাকিবে। অতএব বেসরকারী লোক সংখ্যা গরিষ্ঠ হইল। ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতাও বৃদ্ধি করা হইল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের আইন অনুযায়ী সভ্যরা সরকারের আয়ব্যয়ের খসড়া সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা করিতে পারিতেন। কিন্তু নূতন আইনের ফলে সভ্যরা এই খসড়ার যে কোনটি দফা সম্বন্ধে প্রস্তাব পেশ করিবার অধিকার পাইলেন। সভ্যরা জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও প্রস্তাব উত্থাপন করিবার ক্ষমতা পাইলেন এবং সেই প্রস্তাবের উপর ভোট লইবার ব্যবস্থাও হইল। বড়লাটকে যে কোনও প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা দেওয়া হইল এবং কতকগুলি ব্যাপার ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের আলোচনা ক্ষমতার বহির্ভূত রাখা হইল। বড়লাটের শাসন পরিষদে আইন সদস্যপদে একজন ভারতীয়কে নিযুক্ত করা হইল। ইনি প্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ।

কংগ্রেস যেরূপ প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থা আশা করিয়াছিল, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের আইনে তাহার কোনও ব্যবস্থা হইল না এবং মুসলমানদের জন্য সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন করিয়া এই আইন দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রশ্রয় দিল।

লক্ষ্ণৌ চুক্তি

কংগ্রেসের নরমপন্থীদল প্রথমে মোটামুটি সন্তুষ্ট হইলেও অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিল যে প্রকৃত ক্ষমতা বড়লাট ও ছোটলাটের হাতেই রহিয়া গিয়াছে। বৃটিশ উপনিবেশগুলিতে ভারতীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহার ও দক্ষিণ আফ্রিকায় মোহনলাল করমচাঁদ গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন, ভারতে জাতীয় আন্দোলনের উপর স্বাভাবিক প্রভাব বিস্তার করে। এই সময়ে মুসলমানরা হিন্দুদের সহিত একত্র হইয়া রাজনৈতিক সংগ্রামে যোগদানের আবশ্যকতা অনুভব করে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মুসলিম লীগের সভ্যগণ সংকল্প করেন যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত একত্র হইয়া স্বায়ত্বশাসন লাভের চেষ্টা করিতে হইবে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের মধ্যে যে দুই দল ছিল তাহাদের মিটমাট হয় এবং লক্ষ্ণৌতে মুসলীম লীগ ও কংগ্রেস যুগ্মভাবে শাসন সংস্কারের একটি পরিকল্পনা করে। কংগ্রেস মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের নীতি স্বীকার করে ও মুসলীম লীগ প্রতিশ্রুতি দেয় যে কংগ্রেসের সহিত একযোগে স্বায়ত্বশাসনের জন্ত দাবী করিবে।

হোমরুল লীগ

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পুনাতে বালগঙ্গাধর তিলক 'হোমরুল লীগ' স্থাপন করিলেন। মিসেস অ্যানি বেসাণ্ট নামে একজন ইংরাজ মহিলাও একটি 'হোমরুল লীগ' প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সংস্থাগুলির কংগ্রেসের সহায়ক ভাবে কাজ করিবারই উদ্দেশ্য ছিল। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের যুগ্ম পরিকল্পনার পক্ষে এই হোমরুল লীগগুলি প্রচার কার্য করিতে লাগিল।

মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার

ইতোমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং ভারত বৃটেনকে যথাসাধ্য সাহায্য

করে। বৃটেন এই যুদ্ধে সহযোগিতার জন্য ভারতের ঋণ অস্বীকার করিতে পারিল না। ভারতীয় প্রতিনিধিরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমর সম্মিলনে, যুদ্ধের মন্ত্রণা সভায় এবং শান্তি বৈঠকে স্থান লাভ করিলেন। ভারতের রাজনৈতিক দাবী মিটাইবার আবশ্যকতা সম্বন্ধেও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বিশেষ চিন্তা করিতে থাকে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগু ভারতে বৃটিশ শাসনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এক ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, শাসন ব্যবস্থার প্রত্যেক বিভাগে ক্রমশঃ ভারতীয়দের অধিকতর সহযোগিতার ব্যবস্থা করা এবং ভারতকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে রাখিয়া তথায় ক্রমে ক্রমে একটি দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র গঠন করাই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতি। এই ঘোষণা কার্যকরী করিবার জন্য ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে নূতন ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হয়। এই সময়ে বড়লাট ছিলেন লর্ড চেম্স্‌ফোর্ড (১৯১৬—১৯২১)। তিনি মণ্টেগুর সহিত যুক্তভাবে ভারতের শাসন সংস্কার সম্বন্ধে পার্লামেণ্টের নিকট একটি রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের আইন বিধিবদ্ধ হয় বলিয়া ইহা মণ্টেগু-চেম্স্‌ফোর্ড সংস্কার নামে পরিচিত। এই আইনে ভারত গভর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের মধ্যে শাসন কার্যের বিভিন্ন বিভাগ বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। সমর বিভাগ, ডাক বিভাগ, রেল বিভাগ প্রভৃতি ভারতগভর্ণমেণ্টের অধীনে থাকে। প্রাদেশিক শান্তিরক্ষা, বিচার বিভাগ, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব হয়। প্রাদেশিক শাসনের বিষয়গুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। ভূমি রাজস্ব, কৃষি, সমবায়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলি মন্ত্রীদের কর্তৃত্বাধীনে দেওয়া হয়। ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে মন্ত্রিপদ পূর্ণ করা হইত। মন্ত্রীরা আইন সভার নিকট দায়ী ছিল। অতএব এই কয়েকটি বিষয়ে দায়িত্বপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইল, এবং এই বিষয়গুলির নাম দেওয়া হইল transferred subjects বা হস্তান্তরিত বিষয়। কিন্তু মন্ত্রীদের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া ইচ্ছামত কার্য করিবার ক্ষমতা গভর্ণরকে দেওয়া হইল। প্রাদেশিক শান্তিরক্ষা, রাজস্ব, বিচার বিভাগ প্রভৃতি বিষয়গুলির পরিচালনার ভার সপরিষদ গভর্ণরের হাতেই রহিয়া গেল।

ইহাদের নাম হইল reserved subjects বা সংরক্ষিত বিষয়। এই ভাবে প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারে দ্বৈতশাসন (dyarchy) প্রবর্ত্তিত হইল।

কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ দুইটি কক্ষে বিভক্ত হইল। উচ্চতর কক্ষটির নাম হইল Council of States এবং নিম্নতর কক্ষটির নাম হইল Legislative Assembly. কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় দ্বৈতশাসন প্রবর্ত্তিত হইল না। বড়লাটের শাসন পরিষদ আইন সভার নিকট কোনরূপে দায়ী না থাকাতে আইন সভার সমালোচনা ও অসন্তোষ জ্ঞাপন ব্যতিরেকে কোনই ক্ষমতা রহিল না।

রাউল্যাট্ অ্যাক্ট

কংগ্রেস ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শাসন আইন ভারতের পক্ষে গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল। ভারতের সর্বত্র অশান্তি দেখা দিল। ভারত গভর্ণমেণ্ট দমন নীতি চালাইবার উদ্দেশ্যে রাউল্যাট্ অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ করিল। এই আইনে সংবাদপত্রগুলির স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষমতা খর্ব করা হইল এবং সরকার বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য লোককে কারারুদ্ধ করিয়া রাখার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল।

মহাত্মা গান্ধী

এই সময়ে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহন করিলেন একজন অদ্ভুত ঐশ্বরিক শক্তি সম্পন্ন মানব, মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর পোরবন্দরে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাত যান এবং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। দুই বৎসর পর একটি মামলায় নিযুক্ত হইয়া তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ডার্বান সহরে যান। সেখানে ভারতীয়দের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের ব্যবহার দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং দেশে না ফিরিয়া ভারতীয়দের জন্য ইউরোপীয়দের সমান অধিকার লাভের চেষ্টা করিতে থাকেন। তিনি তথায় নির্যাতিত ভারতীয়দের অহিংস ও শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক সংগ্রাম করিতে শিক্ষা দেন এবং তাহাদের জন্য অবর্ণনীয় দুঃখ ও ক্লেশ বরণ করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতে নানা স্থানে পর্যটন করিয়া তিনি ভারতের অবস্থা

সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন, এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ১৫ই মে আহমেদাবাদে তাঁহার 'সত্যাগ্রহ আশ্রম' স্থাপন করেন। তিনি বলিলেন যে সত্যের অনুসন্ধান ও সত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁহার আশ্রমের ব্রত। দেশবাসীকে সেবা করিবার উপযুক্ত হইবার জন্য আশ্রমিকদের সত্যাগ্রহী, অহিংস ও অনাসক্ত হইবার প্রতিজ্ঞা লইতে আদেশ দিলেন এবং চরকায় সূতা কাটিবার কাজে নিজেকে এবং তাঁহার আশ্রমবাসীদের নিয়োগ করিলেন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের উপলক্ষে যে সভা হয় তাহাতে গান্ধীজী বক্তৃতা করেন। ভারত এই নূতন মানুষটির কিছু পরিচয় পায়। ইহার পর গান্ধীজী ভারতের নানা স্থানে 'স্বদেশী' প্রচার করিতে থাকেন, এবং দেশবাসীর সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক উন্নতির কাজে ব্যাপৃত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহায়তা করেন। তিনি বলেন যে বৃটেনের বিদপকে আমাদের সুযোগ বলিয়া মনে করা উচিত নহে।

জালিয়ানওয়ালা বাগ

রাউল্যাট্ আইন গান্ধীজীর জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল। এই আইনের প্রতিবাদে তিনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল ভারতব্যাপী হরতাল ঘোষণা করিলেন। সেই দিনটি শান্তিপূর্ণ ভাবে কাটিল। ৮ই এপ্রিল গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করিবার জন্য পাঞ্জাবে গেলেন। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এই মিথ্যা সংবাদে নানা স্থানে গোলযোগ বাঁধিয়া গেল। আহমেদাবাদে দোকানপাট লুট হইল, রেল লাইন ও টেলিগ্রাফের তার জখম হইল, ও দুইজন রাজকর্মচারী নিহত হইল। অমৃতসহরে ও লাহোরেও যথেষ্ট অরাজকতা হইল। ১২ই এপ্রিল পাঞ্জাবে জেনারেল ডায়ার চার বা ততোধিক লোকের একত্রে সমাবেশকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই হুকুম তুচ্ছ করিয়া অমৃতসহরের জালিয়ান-ওয়ালাবাগে এক সভা হয়। জেনারেল ডায়ার আইন অমান্যের অপরাধে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলিবর্ষন করেন। শত শত লোক গুলির আঘাতে

হতাহত হয়। এই ঘটনায় সমগ্র ভারতবর্ষে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। প্রতিবাদ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ বৃটিশ সরকার প্রদত্ত 'স্যার' উপাধি পরিত্যাগ করিলেন।

খিলাফত আন্দোলন

প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষ, অর্থাৎ ইংরাজদের বিপক্ষ, গ্রহণ করে। যুদ্ধের পর সেভার্সের সন্ধি অনুযায়ী তুর্কী সাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ডিত করিয়া কতকগুলি নূতন রাজ্যের সৃষ্টি করা হয় এবং তুরস্কের সুলতানের জন্য তাঁহার বিরাট সাম্রাজ্যের সামান্য একটি অংশ অবশিষ্ট থাকে। সমগ্র মুসলমান জগৎ তুরস্কের সুলতানকে 'খলিফা' বা ধর্মগুরু বলিয়া গণ্য করিত। তাহাদের ধর্মগুরুর এই অবস্থা হওয়াতে সকল দেশের মুসলমানদের মধ্যেই চাঞ্চল্য দেখা দিল। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যেও এই ব্যাপারে অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। খলিফার পক্ষ লইয়া তাহারা যে আন্দোলনে যোগদান করিল তাহা 'খিলাফত আন্দোলন' নামে পরিচিত।

কলিকাতা ও নাগপুর কংগ্রেস (১৯২০ খৃঃ)

গান্ধীজী এই আন্দোলনের মধ্যে জাতীয় সংগ্রামে হিন্দু ও মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার সুযোগ খুঁজিয়া পাইলেন। হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের মধ্যে বহু বৈঠক হইল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট গান্ধীজী বড়লাটকে এক পত্র প্রেরণ করিলেন। তিনি জানাইলেন যে খলিফার প্রতি ইংরাজদের ব্যবহারের ও পাঞ্জাবে নৃশংসতার প্রতি সরকারের ঔদাসীন্যের প্রতিবাদে তিনি অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতায় লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হইল। গান্ধীজীর পরিকল্পনা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। একই সময়ে কলিকাতায় মুসলীম লীগের অধিবেশন হইল এবং মুসলমানরা অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিতে সঙ্কল্প করিল। কংগ্রেসের ১৯২০ খৃষ্টাব্দের বাৎসরিক অধিবেশন নাগপুরে হইল। গান্ধীজীকে অসহযোগ আন্দোলন চালাইবার অনুমতি দেওয়া হইল। সত্যাগ্রহের সাহায্যে ন্যায্য ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ লাভ কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হইল।

নূতন পথের সন্ধান

এই সময় হইতে গান্ধীজী ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেন। তিলক ও অন্যান্য পুরাতন নেতারা পরলোক গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত প্রধান নেতৃত্বের জন্য প্রতিযোগিতা করিবার মত আর কেহ ছিল না। তিনি এই নিরস্ত্র ও দুর্বল জাতিকে দুর্দ্ধর্ষ বৃটিশ শক্তির হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য এক নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। সত্য, অহিংসা ও প্রেমের বাণী প্রচার করিয়া তিনি দেশবাসীকে সংগ্রামের উপযুক্ত হইতে শিক্ষা দেন। তিনি বলেন যে অহিংসা নীতিতে সংগ্রাম চালাইলে শত্রু যত বড় শক্তিশালী হউক না কেন, তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতেই হইবে। তিনি দেখান যে হিংসার প্রতিক্রিয়া ভয়াবহ ও হিংসার দ্বারা কোনও সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। তাঁহার এই নৈতিক আদর্শ তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত অসহযোগ করিতে হইবে, আইনও অমান্য করিতে হইবে, কিন্তু সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইবে না, হিংসাত্মক কোনও কার্য্য করিবে না এবং সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ভাবে সংগ্রাম পরিচালিত হইবে। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহা ছিল এক নূতন আদর্শ। গান্ধীজী যে নূতন পথের সন্ধান দিলেন সেই পথ অনুসরণ করিয়া ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এবং আজিও সেই পথের পথিক হিসাবে জগত সভায় সম্মানের আসন পাইয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতা লাভ

অসহযোগ আন্দোলন : প্রথম পর্য্যায়

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ভারত গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে মাতিয়া উঠিল। গভর্ণমেণ্টের খেতাবধারী লোকরা খেতাব ত্যাগ করিতে লাগিল, আইন ব্যবসায়ীরা আদালতের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিল, ছাত্ররা স্কুল-কলেজ ছাড়িল, শিক্ষকরা শিক্ষকতা ত্যাগ করিল, গভর্ণমেণ্টের কর্মচারীরা চাকুরি ছাড়িল। রাশি রাশি বিদেশী বস্ত্র অগ্নিসাৎ হইল ও নেতারা চতুর্দিকে জনসভা করিয়া সয়তানের রাজত্ব ধ্বংস করিবার আহ্বান জানাইল।

ঐ বৎসর লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের স্থলে লর্ড রেডিং (১৯২১-১৯২৬) বড়লাট হইলেন। ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জের পুত্র প্রিন্স অফ্‌ ওয়েল্‌স্‌ ভারত পর্যটনে আসিলেন। কংগ্রেস তাঁহাকে বয়কট করিল। বৃটিশরা দৃঢ় হস্তে অসহযোগ আন্দোলন দমনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিল। সভাসমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইল। বহুস্থানে দাঙ্গা হইল ও সহস্র সহস্র ভারতবাসী কারারুদ্ধ হইল। পর বৎসর যুক্তপ্রদেশে চৌরিচওরায় গ্রামবাসীরা স্থানীয় থানাতে অগ্নিসংযোগ করিলে কয়েকজন সিপাহী দগ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইল। গান্ধীজী অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। ভারত অসহযোগ আন্দোলনের জন্য নৈতিক ভাবে প্রস্তুত নহে বলিয়া তিনি আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিলেন এবং কংগ্রেসকে গঠনমূলক কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে ব্রতী হইলেন। কিন্তু তাঁহার ছয় বৎসরের জন্য কারাদণ্ড হইল। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়াতে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল।

স্বরাজ্য পার্টি ও আইন সভায় প্রবেশ

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন দাস ও মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে এক দল রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাইবার এক নূতন পথ অবলম্বন করিতে

সিদ্ধান্ত করিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের আইনে অসন্তুষ্ট হইয়া কংগ্রেস আইন সভাগুলিতে প্রবেশ করে নাই। এই নূতন দল কংগ্রেসের বর্জননীতি ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিল। আইন সভাগুলির সভ্য হইয়া, প্রতিপদে সরকারের কাজে বাধা সৃষ্টি করিয়া, শাসন কার্যকে অচল করিয়া তোলাই তাহাদের উদ্দেশ্য হইল। এই দলের নাম হইল 'স্বরাজ্যদল'। পরবর্তী নির্বাচনে স্বরাজ্য দলের বহু সভ্য আইন সভাগুলিতে প্রবেশ করে। বাংলায় ও মধ্যপ্রদেশে এই দলের সভ্যরা আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হন ও আইন সভার কার্যে বাধা দিয়া সরকারকে যথেষ্ট বিব্রত করেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন দাসের অকাল মৃত্যুতে এই দলের প্রভাব হ্রাস প্রাপ্ত হয়।



চিত্তরঞ্জন দাস

সাইমন্ কমিশন

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড রেডিং এর পরিবর্তে লর্ড আরুউইন বড়লাট পদে নিযুক্ত হন। তিনি ভারতীয় নেতাদের সহিত আপোষ করিয়া ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যগ্র হইলেন। তখন ভারতের সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্ ছিলেন লর্ড বার্কেনহেড্। তিনিও কালক্ষেপ না করিয়া এই ব্যাপারের সমাধান আবশ্যক বলিয়া অনুভব করিলেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনে বলা হইয়াছিল যে ভারতে দায়িত্ব পূর্ণ শাসনের প্রসার, সংস্কার বা সঙ্কোচের সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য দশ বৎসর পর পার্লামেণ্ট একটি কমিশন নিযুক্ত করিবে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে এই কমিশন নিযুক্ত হইবার কথা ছিল। কিন্তু তাহার দুই বৎসর পূর্বেই পার্লামেণ্টের উভয়

কক্ষের সাতজন সভ্য লইয়া একটি কমিশন গঠিত হইল। ইহার সভাপতি হইলেন স্যার জন্ সাইমন্। ভারতীয় নেতারা এই কমিশন বয়কট করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, যে কমিশন ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করিবে তাহাতে ভারতীয় সভ্য থাকা উচিৎ ছিল। তখন সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ লর্ডস্ সভার সভ্য। অতএব পার্লামেণ্টের সভ্যদের দ্বারা গঠিত কমিশনের মধ্যে একজন উপযুক্ত ভারতীয় নিযুক্ত করা সম্ভব ছিল। ভারতবাসী এই ত্রুটিকে তাহাদের অপমান বলিয়া গ্রহণ করিল। যাহা হউক সাইমন্ কমিশন দুইবার ভারতে আসে। তাহারা প্রদেশগুলিকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দান করিবার জন্য সুপারিশ করে, কিন্তু তাহারা কেন্দ্রে স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থা না করাতে অধিকাংশ ভারতবাসী তাহাদের রিপোর্ট গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া মনে করে।

নেহেরু রিপোর্ট : পূর্ণ স্বরাজের দাবী

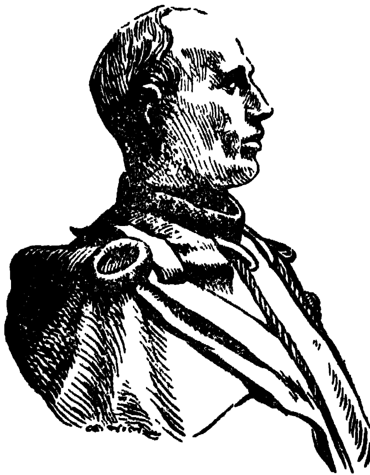
ইতোমধ্যে, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে, মাদ্রাজে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতে পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীতে এক সর্বদলীয় সম্মেলন হয়। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র কি ভাবে গঠিত হইবে তাহার একটি খসড়া তৈয়ারী করিবার জন্য এই সম্মেলন একটি কমিটি নিয়োগ করে। মতিলাল নেহেরু, তেজ বাহাদুর সপ্রু প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই কমিটির সভ্য হন। ইঁহাদের রিপোর্ট "নেহেরু রিপোর্ট" নামে পরিচিত। এই রিপোর্ট ভারতের জন্য 'ডোমিনিয়ান মর্যাদা'



মতিলাল নেহেরু

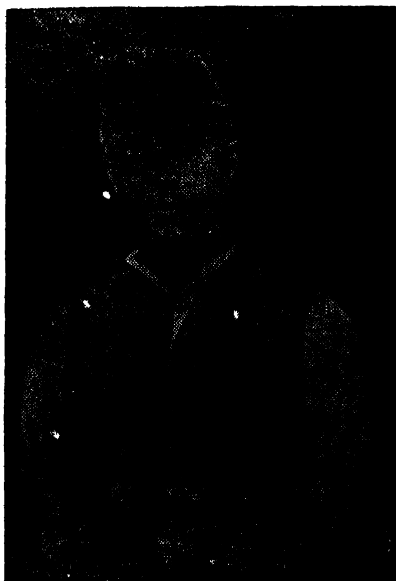
(dominion status) দাবী করে। কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী দল নেহেরু রিপোর্ট সমর্থন করিল না। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যেই "ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ" বা স্বাধীনতাকামী দল গঠিত হইল। এই দলের কর্মসচিব হইলেন জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁহারা ঘোষণা করিলেন যে ডোমিনিয়ন মর্যাদা তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিতে পারে না; পূর্ণ স্বরাজ বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের লক্ষ্য। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয় কলিকাতায়। সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহেরু পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উপস্থিত করেন। কিন্তু গান্ধীজীর প্রভাবে কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করে যে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ শেষ হইবার পূর্বে যদি ডোমিনিয়ান মর্যাদা প্রাপ্ত হওয়া যায় তবে তাহা গ্রহণ করা হইবে।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর লর্ড আরউইন ঘোষণা করিলেন যে ভারতের ডোমিনিয়ন মর্যাদা লাভই বৃটিশ শাসনের লক্ষ্য এবং ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতির স্বাভাবিক পরিণতি। তিনি বলিলেন যে সাইমন্ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে পর ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রের খসড়া তৈয়ারী করিবার জন্য লণ্ডনে এক গোল টেবিল বৈঠক আহূত হইবে। ভারতের ডোমিনিয়ন মর্যাদা প্রাপ্তির সম্ভাবনায় ইংলণ্ডে একদল লোক অসন্তুষ্ট হইল ও লর্ড আরউইনের ঘোষণার নিন্দা করিতে লাগিল। ভারতীয় নেতাগণ কোনও অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ডোমিনিয়নদের ন্যায় স্বায়ত্ত শাসন লাভের আশায় অপেক্ষা করিয়া থাকা অনুচিত হইবে বলিয়া মনে করিলেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লাহোরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে



লর্ড আর্উইন্

সভাপতিত্ব করেন জওহরলাল নেহেরু। পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ ভারতের লক্ষ্য বলিয়া কংগ্রেস ঘোষণা করে। সিদ্ধান্ত হয় যে কংগ্রেস প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিবে না, গভর্ণমেণ্টের সহিত অসহযোগিতা করা হইবে ও সরকারী আইন অমান্য করা হইবে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী 'স্বাধীনতা দিবস' বলিয়া ঘোষিত হয় এবং ঐ দিন অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করার তারিখ স্থির হয়।



জওহরলাল নেহেরু

অসহযোগ আন্দোলন ঃ দ্বিতীয় পর্যায়

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হইল। সর্বত্র ত্রিরঞ্জিত পতাকা উত্তোলিত হইল ও সভা সমিতি করিয়া সরকারের সহিত অসহযোগ ও আইন অমান্য করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলা হইল।

ঐ বৎসর ১২ই মার্চ মহাত্মা গান্ধী কয়েকজন অনুচর সহ তাঁহার ঐতিহাসিক ডাণ্ডি অভিযান আরম্ভ করিলেন। ডাণ্ডি বোম্বাই প্রদেশের সমুদ্র উপকূলে একটি গ্রাম। সমুদ্রের উপকূলে গিয়া লবণ তৈয়ারী করিয়া লবণ আইন ভঙ্গ করা এই যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল। মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘ পথ পদব্রজে যাইলেন। যে সকল গ্রামের মধ্য দিয়া তিনি যাইলেন সেই সকল গ্রামের অধিবাসীদের তিনি বিলাতি বস্ত্র ও মাদক দ্রব্য ত্যাগ করিতে, খদ্দর পরিধান করিতে, সরকারের সহিত অসহযোগ করিতে ও অহিংসার পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিলেন।

গান্ধীজীর অনুকরণে চতুর্দিকে লবণ আইনের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ

হইল। বিলাতি বর্জন, স্কুল কলেজে ধর্মঘট ইত্যাদি চলিতে লাগিল। গভর্ণমেণ্ট, গান্ধী, জওহরলাল প্রভৃতি বহু নেতাকে গ্রেপ্তার করিল এবং কোনও কোনও স্থানে সামরিক আইন (martial law) জারী করিল।

এই অসহযোগ আন্দোলনে বহু ভারতীয় মহিলা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে অনেকে এই আন্দোলন সমর্থন করে নাই।

গোলটেবিল বৈঠক

ইতোমধ্যে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট লণ্ডনে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সভা আহ্বান করে। এই গোল টেবিল বৈঠক ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর হইতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী পর্যন্ত হয়। তখন গান্ধীজী কারারুদ্ধ ছিলেন এবং এই গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যোগদান করে নাই। কংগ্রেসকে বাদ দিয়া ভারতের জন্য কোনও সংবিধান প্রচলন করা অসম্ভব জানিয়া লর্ড আরউইন মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দিলেন। মহাত্মা গান্ধী লর্ড আরউইনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ দিল্লীতে উভয়ের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তি অনুযায়ী গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করিলেন। লর্ড আরউইন দমননীতি মূলক আইনগুলি রদ করিলেন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের অপরাধে যাঁহারা কারারুদ্ধ ছিলেন তাঁহাদের সকলকে মুক্তি দিলেন। গোল টেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় লণ্ডনে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে এই অধিবেশনে যোগদান করিলেন। কিন্তু মুশ্‌লিম লিগের নেতা মহম্মদ আলী জিন্না এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিলেন যে গান্ধীজীকে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। ইতোমধ্যে ভারতে নানাস্থানে গোলযোগ চলিতে থাকে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আবদুল গফর খাঁ গান্ধীজীর পন্থা অবলম্বনে গণ-আন্দোলন চালাইতে থাকেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে লর্ড উইলিংডন (১৯৩১—৩৬) বড়লাট পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ভারতে গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা



দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক—১৯৩১ খৃঃ

অবলম্বন করিলেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে গান্ধীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলে কংগ্রেস পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন চালাইবার ব্যবস্থা করিতে থাকে। লর্ড উইলিংডন কংগ্রেসকে একটি বে-আইনী সংস্থা বলিয়া ঘোষণা করিলেন ও গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতাদের কারারুদ্ধ করিলেন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (Communal Award)

কংগ্রেসের সহিত মুশ্‌লিম লীগের মতানৈক্যের জন্য দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক বিফল হয়। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ড্‌ এই বিরোধের মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যে আইনসভাগুলিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আসন সম্বন্ধে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে একটি ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা" নামে পরিচিত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির জন্য পৃথক নির্বাচনের ও আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। মুসলমানরা বাংলায় ও পাঞ্জাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, তথাপি তাহাদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হইল। হিন্দুদের মধ্যে অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির জন্য আসন সংরক্ষিত হইল। কিন্তু তাহারা সাধারণ আসনের জন্যও প্রার্থী হইতে পারিবে বলা হইল। ভারতীয়দের ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করা হইল। শুধু তাহাই নহে, এই বাঁটোয়ারা হিন্দুদের মধ্যেও বিভেদ স্থষ্টি করিল। গান্ধীজী তখন পুনায় আগা খাঁ প্রাসাদে কারারুদ্ধ ছিলেন। তিনি এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে অনশন আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের সহিত অনুন্নত হিন্দুদের একটা মিটমাটের ব্যবস্থা হইল। এই ব্যবস্থা 'পুনা চুক্তি' নামে পরিচিত। পুনা চুক্তির পর গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করেন (সেপ্টেম্বর ১৯৩২)।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে কংগ্রেস যোগদান করে নাই। গোল টেবিল বৈঠকের সুপারিশ ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিজস্ব প্রস্তাবগুলি একত্র করিয়া একটি white paper বা সরকারী দলিল প্রকাশিত হয়। এই দলিলের বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী অসন্তোষ দেখা দেয়, কিন্তু লর্ড উইলিংডনের

দমন নীতির জন্য অসহযোগ আন্দোলন চালানো কঠিন হইয়া পড়ে। হোয়াইট পেপারটি ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের সভ্যদের দ্বারা একটি জয়েণ্ট কমিটিতে (Joint committe) বিবেচিত হয়। এই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে পার্লামেণ্টে ভারতের জন্য একটি সংশোধিত সংবিধানের খসড়া পেশ করা হয় এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাহা আইনে পরিণত হয়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারত এই সংবিধান অনুযায়ী শাসিত হয়।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইন বৃটিশ শাসিত প্রদেশগুলিকে লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। দেশীয় রাজ্যগুলিকে ইচ্ছানুযায়ী এই যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। প্রদেশগুলিতে দ্বৈত শাসনের পরিবর্তে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করা হয়।

এই আইনে কেন্দ্রীয় শাসনের যে ব্যবস্থা হয় তাহাতে কংগ্রেস সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। উপরন্তু গভর্ণর ও গভর্ণর জেনারেলকে আইন সভা ও মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যকলাপ নাকচ করিবার অধিকার দেওয়াতে কংগ্রেসের এই আইনকে গণতন্ত্র-বিরোধী বলা ন্যায্য হয়। কংগ্রেস এই আইন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করে।

সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস শাসন

কংগ্রেসের বয়ঃজ্যেষ্ঠ নেতারা আইনসভাগুলির সদস্য নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার উপদেশ দেন এবং আইনসভাগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই সংবিধানকে অচল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সাধারণ নির্বাচনের ফলে কংগ্রেস ১১টি প্রদেশের মধ্যে সাতটি প্রদেশের আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হইল। কিন্তু কংগ্রেস নেতাগণ বলিলেন যে প্রাদেশিক গভর্ণরগণ তাঁহাদের বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করিবেন না এই প্রতিশ্রুতি না দিলে তাঁহারা মন্ত্রিসভা গঠন করিবেন না। এই ব্যাপারের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত প্রদেশগুলি অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভা দ্বারা পরিচালিত হইতে লাগিল। অবশেষে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোর আশ্বাসবাণীতে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করে। সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং দুইটি প্রদেশে

কংগ্রেস অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সহিত যুগ্ম মন্ত্রিসভা গঠন করে। পাঞ্জাবে ও বাংলায় আইন সভায় মুস্লিম লীগের সভ্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় ও এই দুইটি প্রদেশে লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করে। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত দুই বৎসরের কিছু অধিক কাল শাসন কার্য পরিচালনা করে। যাহারা বলিয়াছিল যে কংগ্রেস কেবলমাত্র সমালোচনা করিতে পারে ও আন্দোলন চালাইতে জানে তাহারা দেখিল যে কংগ্রেসের সভ্যরা গঠনমূলক কার্যেও সমান পটু। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে সকল প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করিলেন।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের জনগণের অনুমতি বিনা ভারতকে মিত্র শক্তির অন্যতম বলিয়া ঘোষণা করে। ইহাতে ভারতীয় জনমত ক্ষুব্ধ হয়। কংগ্রেস বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। যদি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া থাকে তাহা হইলে যুদ্ধের অবসানে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করা হইবে কি না তাহা কংগ্রেস জানিতে চায় এবং ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বায়ত্ত শাসনের ব্যবস্থা করা উচিত তাহা জানায়। বড়লাটের নিকট এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়াতে প্রদেশগুলির কংগ্রেসী মন্ত্রিরা পদত্যাগ করিল। সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলি হইতে মন্ত্রিসভা গঠন অসম্ভব জানিয়া এই সকল প্রদেশের গভর্ণরগণ শাসনভার নিজ নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। এই ভাবে ভারতের সাতটি প্রদেশে দুই বৎসর তিন মাসের পর কংগ্রেস শাসনের অবসান হইল।

যুদ্ধের গতি বৃটিশদের বিপক্ষে যাওয়াতে তাহারা ভারতীয় জনমত তুষ্ট করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিতে লাগিল। বড়লাট তাঁহার শাসন পরিষদ সম্প্রসারিত করিয়া অধিকাংশ ভারতীয় সভ্য নিযুক্ত করিলেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো ঘোষণা করিলেন যে যুদ্ধাবসানে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান ভারতীয়রা নিজেরাই রচনা করিবে এবং এই উদ্দেশ্যে ভারতের প্রধান দলগুলির প্রতিনিধিদের লইয়া একটী সভা আহ্বান করা হইবে; কিন্তু যে সংবিধান ভারতের সকল শ্রেণীর লোকের সমর্থন লাভ

করিতে পারিবে না, সেরূপ শাসন ব্যবস্থায় বৃটিশ সরকার স্বীকৃত হইতে পারে না।

পাকিস্থান দাবী

মহম্মদ আলী জিন্না যে পথে মুস্লিম লীগ চালিত করিতেছিলেন তাহাতে বড়লাটের ঘোষণায় কাহারও আশান্বিত হইবার কারণ দেখা গেল না। বোঝা গেল যে হিন্দু-মুসলমানের মতানৈক্যের অজুহাতে বৃটিশরা ভারতকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভে বাধা দিবে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হইতেই জিন্না তাঁহার উগ্র সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিতেছিলেন। ঐ বৎসর তিনি মুসলমানদের জন্য ভারতের শাসন ব্যাপারে বিশেষ ও পৃথক স্থান করিয়া লইবার চেষ্টা আরম্ভ করেন। তিনি মুসলমানদের পক্ষে যে চৌদ্দ দফা দাবী করেন তাহা জাতীয়তা বোধের বিরোধী। এই সকল দাবী ক্রমশঃ মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবীতে পরিণত হইল। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জিন্নার নেতৃত্বে মুস্লিম লীগ পাকিস্থান গঠনের দাবী প্রচার করিল। এই সময়ে মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন করিতে আদেশ দেন।

ক্রীপ্‌স্ মিশন

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে জাপান ব্রহ্মদেশ অধিকার করাতে উইন্‌ষ্টন্ চার্চ্চিলের গভর্ণমেণ্ট বিচলিত হইল ও ভারতের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সমাপ্তির জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তাহারা স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌কে ভারতের জাতীয় নেতাদের সহিত আলাপ আলোচনার জন্য প্রেরণ করিল। ক্রীপ্‌স্ ভারতে আসিয়া যে সকল প্রস্তাব করিলেন তাহা কংগ্রেস বা মুস্লিম লীগ গ্রহণযোগ্য মনে করিল না। ক্রীপ্‌সের দৌত্য ব্যর্থ হইল।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব

মহাত্মা গান্ধী স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে বৃটিশরা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ফলে তাহারা অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত ভারতে আধিপত্য করিবে। তিনি বলিলেন যে বৃটিশরা যতদিন ভারতে

থাকিবে ততদিন হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মিটমাট হওয়া অসম্ভব। অতএব তিনি বৃটিশদের ভারত ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট কংগ্রেস কমিটি গান্ধীজীর মত সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিল।



মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী

পরদিন ভারত গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিল ও গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতৃবর্গ কারারুদ্ধ হইলেন। গভর্ণমেণ্ট মনে করিয়াছিল যে এই ভাবে কোনও রূপ নূতন আন্দোলন বন্ধ করা যাইবে। কিন্তু তাহাদের দমন নীতির বিপরীত ফল হইল। ভারতে চতুর্দিকে 'ভারত ছাড়' রব প্রতিধ্বনিত হইল এবং যে স্বতঃস্ফুর্ত্ত আন্দোলন আরম্ভ হইল তাহা নেতৃহীন অবস্থায় বিদ্রোহের আকার ধারণ করিল। আন্দোলনকারীদের আক্রোশ সরকারী সম্পত্তির উপর পড়িল। তাহারা রেল লাইন, টেলিগ্রাফ তার, সরকারী গৃহ ইত্যাদি নষ্ট করিতে লাগিল। বৃটিশ সরকার যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা অবলম্বন করিল। পুলিশের অত্যাচারে ও সেনাবাহিনীর গুলিতে বহু নির্দোষ ভাতরবাসী প্রাণ হারাইল। সহস্র সহস্র লোক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। এই 'ভারত ছাড়' আন্দোলন হিংসার আশ্রয় লওয়াতে গান্ধীজী অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন ও তিন সপ্তাহব্যাপী অনশন করিলেন। এই সময়ে বাংলা দেশে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। গ্রামাঞ্চলের বহু বুভুক্ষু লোক খাদ্যান্বেষণে কলিকাতায় আসিয়া পড়ে এবং এই সমৃদ্ধিশালী নগরে খাদ্যাভাবে কোটিপতিদের গৃহের সম্মুখে রাস্তায় পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বসুকে গভর্ণমেণ্ট কলিকাতায় স্বগৃহে অন্তরীণ রাখিয়াছিল। তিনি কি ভাবে ছদ্মবেশে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া আফগানিস্থানের পথে বার্লিনে গিয়া হিটলারের সহিত আলাপ আলোচনা করেন এবং তথা হইতে টোকিওতে গিয়া জাপানীদের সাহায্য আদায় করেন এবং সিঙ্গাপুরে আসিয়া আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করেন তাহা এই আধুনিক যুগের এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। জাপানীদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধরত বহু ভারতীয় সৈন্য বৃটিশপক্ষ ত্যাগ করিয়া জাপানীদের দিকে চলিয়া যায়। এই সময়ে সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের লইয়া এবং প্রবাসী ভারতীয়দের অকুণ্ঠ সাহায্যে সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। এই ফৌজে হিন্দু, মুসলমান, পাঞ্জাবী, মারাঠী, দাক্ষিণাত্যবাসী, প্রদেশ ও ধর্ম নির্বিশেষে যোগদান করে এবং তাহাদের অন্তরের ভক্তি ও শ্রদ্ধা দিয়া সুভাষচন্দ্রের অনুগামী হয়। এই সময় হইতে সুভাষচন্দ্র 'নেতাজী' নামে পরিচিত হন। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দখল করে এবং "দিল্লী চলো" রবে ভারত অভিমুখে যাত্রা করে। তাহারা আরাকান ও মণিপুর দখল করিয়া কোহিমা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। কিন্তু যথেষ্ট রসদের অভাবে তাহাদের পশ্চাৎপদ হইতে হয়। বৃটিশরা ক্রমে জাপানীদের হাত হইতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া



সুভাষচন্দ্র বসু

পুনরুদ্ধার করে। এই সময়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ বৃটিশদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। বৃটিশরা এই ফৌজের কয়েকজন সৈন্যাধ্যক্ষের দিল্লীর লাল কেল্লায় বিচার আরম্ভ করে। জওহরলাল নেহেরু স্বয়ং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের উকিল হিসাবে এই বিচারে উপস্থিত হন। কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতের জনসাধারণ এই বিচারের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে। গভর্ণমেণ্ট এই বিচার বন্ধ করিতে বাধ্য হয়।

ইতোমধ্যে লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো ভারত হইতে বিদায় লইয়াছিলেন ও তাঁহার পরিবর্তে লর্ড ওয়েভেল্‌ বড়লাট পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। লর্ড ওয়েভেল্‌ ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সিমলায় একটি সর্বদলীয় বৈঠক আহ্বান করেন। জিন্না কোনও ব্যবস্থায় রাজী না হওয়াতে এই বৈঠক বিফল হয়।

ক্যাবিনেট মিশন

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়। যুদ্ধাবসানের পর ইংলণ্ডে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাহার ফলে শ্রমিকদল (Labour Party) সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় এবং মন্ত্রিসভা গঠন করে। ক্লেমেণ্ট্‌ এট্‌লি প্রধান মন্ত্রী হন। মিঃ এট্‌লি ভারতের অচল রাজনৈতিক অবস্থা দূর করিতে বদ্ধপরিকর হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বৃটিশ মন্ত্রিপরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে লর্ড পেথিক্‌ লরেন্স, স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌ ও মিঃ আলেকজাণ্ডার, এই তিন জনকে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে, ভারতে প্রেরণ করেন। ইহা Cabinet Mission নামে পরিচিত। এই মিশন পাকিস্থান গঠনের দাবীতে স্বীকৃত হয় নাই। তাঁহারা বৃটিশ শাসিত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলি লইয়া এক অখণ্ড ভারতীয় রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত করেন। স্থির হয় যে ভারতীয়রাই এই রাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করিবে এবং এই উদ্দেশ্যে একটি গণপরিষদ গঠিত হইবে। যতদিন ভারতের নূতন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হয় ততদিন এক অস্থায়ী শাসন পরিষদ অন্তর্বর্তী সরকার হিসাবে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনের ভার লইবে।

গণপরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ হইল। জিন্না দেখিলেন যে

তাঁহার সকল প্রচেষ্টা বিফল হইয়া যাইতেছে। তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই আন্দোলনের নামে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট কলিকাতায় যে ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয় তাহাতে বহুলোক প্রাণ হারায়। নোয়াখালী, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলেও মুসলমান গুণ্ডারা হিন্দুদের গৃহে অগ্নিসংযোগ করে, হিন্দু নারীদের উপর অত্যাচার করে এবং অসংখ্য হিন্দুর প্রাণ নাশ করে। বিহার ও উত্তর প্রদেশে এই সকল অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ও বহু মুসলমান নিহত হয়। আবার মুসলমানদের অত্যাচারে পাঞ্জাবে শিখদেরও বাংলায় হিন্দুদের ন্যায় অবস্থা হয়।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে এক অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গণপরিষদের সভা আরম্ভ হয়, কিন্তু মুস্লিম লীগ যোগদান করে না।

ভারত বিভাগ ও স্বাধীনতা লাভ

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করিলেন যে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে বৃটিশরা ভারত ত্যাগ করিবে। কিন্তু তাহারা কাহার হাতে ক্ষমতা দিয়া যাইবে, সে সমস্যা অমীমাংসিত রহিয়া গেল। বৃটিশ মন্ত্রিসভা লর্ড ওয়েভেলের পরিবর্তে লর্ড মাউন্ট্‌ব্যাটেনকে গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত করিল এবং ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবার ভার তাঁহার উপর দিল। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন লর্ড মাউন্ট্‌ব্যাটেন তাঁহার নূতন পরিকল্পনা ঘোষণা করিলেন। তিনি জানাইলেন যে যেহেতু ভারতের ঐক্য বজায় রাখিয়া কোনও পরিকল্পনাই সর্বদলের সম্মতি লাভ করিতে পারে নাই, সেই হেতু ভারতবর্ষ, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও



লর্ড মাউন্টব্যাটেন

পাকিস্থান এই দুই ভাগে বিভক্ত হইল। সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান, পূর্ব বঙ্গ ও আসামের শ্রীহট্ট জেলা লইয়া পাকিস্থান গঠিত হইল। অবশিষ্ট অঞ্চলগুলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে রহিয়া গেল। জিন্নার আশা পূর্ণ হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া কংগ্রেস এই ব্যবস্থা মানিয়া লইল।

মাউন্ট্‌ব্যাটেনের পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারত স্বাধীনতা আইন বিধিবদ্ধ হইল। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারত ও পাকিস্থান নামক বৃটিশ কমনওয়েল্‌থের অন্তর্ভুক্ত দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্ম হইল। লর্ড মাউন্ট্‌ব্যাটেন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ও মহম্মদ আলী জিন্না পাকিস্থানের গভর্ণর জেনারেল হইলেন। দুইটি স্বতন্ত্র গণপরিষদ এই দুইটি রাষ্ট্রের সংবিধান রচনা কার্যে ব্যাপৃত হইল।

দীর্ঘকাল সংগ্রামের পর ভারত মাতার অঙ্গচ্ছেদ করিয়া ভারতবাসী বিদেশী শাসন হইতে মুক্তি লাভ করিল। কিন্তু ভারতকে স্বাধীন জীবনে সংগত পথে পরিচালিত করিবার জন্য যে মহান ব্যক্তির একান্ত আবশ্যক ছিল তাঁহাকে আমরা হারাইলাম। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী নাথুরাম গড্‌সে নামক একজন আততায়ীর গুলিতে মহাত্মা গান্ধীর জীবনের অবসান হইল। এই দুর্ঘটনায় সমগ্র ভারত মুহ্যমান হইয়া পড়িল।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর ভারতীয় গণপরিষদ স্বাধীন ভারতের শাসন ব্যবস্থার গঠন কার্য সমাপ্ত করিল। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী হইতে ভারতের নূতন সংবিধানের প্রচলন হইল। এই সংবিধান ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (Sovereign Democratic Republic) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। ভারতের শেষ গভর্ণর জেনারেল চক্রবর্তী রাজা গোপাল আঁচারী (১৯৪৮-১৯৫০ জানুয়ারী) বিদায় গ্রহণ করিলেন ও নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হইলেন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে নূতন সংবিধান অনুযায়ী ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয় এবং আইন-সভাগুলি গঠিত হয়। ঐ বৎসর হইতে নূতন শাসন ব্যবস্থা পূর্ণভাবে

কার্যকরী হয়। কংগ্রেস দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়াতে তাহারা মন্ত্রিসভা গঠন করে। জওহরলাল নেহেরু প্রধান মন্ত্রী হন।

এই দশ বৎসরে স্বাধীন ভারত দুইটি পাঁচশালা পরিকল্পনার দ্বারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করিয়াছে। পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে জওহরলালের নেতৃত্বে স্বাধীন ভারত শান্তি ও মৈত্রীর উপাসক হিসাবে জগৎ সভায় বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে।

দশম পরিচ্ছেদ

বিগত একশত বৎসরের মধ্যে ভারতের রূপ পরিবর্ত্তন

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন (১৮৫৮-১৯৪৭)

রাজনীতি ক্ষেত্রে বিগত একশত বৎসরের মধ্যে ভারতের যেরূপ পরিবর্তন হয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তদনুরূপ বিরাট পরিবর্তন হয়, এবং ভারত আধুনিক যুগের একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

বৃটিশদের সহিত সংযোগের প্রথম অধ্যায়ে ভারত তাহার অর্থ দিয়া বৃটেনকে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হইতে সাহায্য করে। ভারত হইতে অল্প দরে কাঁচা মাল লইয়া গিয়া, যন্ত্রের সাহায্যে নানাপ্রকার ব্যবহার্য্য দ্রব্যে পরিণত করিয়া এবং সেই সকল তৈয়ারী মাল ভারতে আনিয়া বৃটেন বহুকাল ধরিয়া ভারতের বাজার প্লাবিত করিতে থাকে। এই সকল দ্রব্যের সহিত ভারতীয় কুটীর শিল্প প্রতিযোগিতা করিতে পারে না এবং ক্রমশঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যও ইউরোপীয়দের হাতে চলিয়া যায়। কৃষিকার্য্য ব্যতীত ভারতীয়দের অর্থোপার্জনের আর বিশেষ কোনও উপায় থাকে না। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ক্রমে তাহাদের মূলধন জমিতে খাটাইয়া নিরুঞ্ঝাটে জমিদারী করিতে থাকে। দরিদ্র কৃষকদের শোষণ তাহাদের একমাত্র উপজীবিকা হয়।

ক্রমশঃ ভারতের নিদ্রাভঙ্গ হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ভারতীয়রা আধুনিক পদ্ধতি অনুযায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে থাকে। মধ্য ও পশ্চিম ভারতে, যে সকল স্থানে তুলার চাষ হয় সেই সকল স্থানে, বস্ত্র শিল্পের কারখানা স্থাপিত হইল। ভারতীয় মিলজাত বস্ত্রের বহুকাল পর্যন্ত বিলাতে তৈয়ারী বস্ত্রের সহিত কঠিন প্রতিযোগিতা করিতে হয়। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্পের স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অসুবিধা করিতে ত্রুটি করে না। অতএব আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি মন্দ গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বহু নূতন ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে ও পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলি উৎসাহিত হয়। বস্ত্র শিল্প ব্যতিরেকে ভারতে ইস্পাত, সিমেণ্ট, ঔষধ, কাঁচ, সাবান ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কারখানা স্থাপিত হয়। স্বাধীনতার পর প্রচুর পরিমাণে দেশী ও বিদেশী মূলধনের সাহায্যে নানারূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান ভারতে স্থাপিত হইয়াছে। খনিজ পদার্থের উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কুটীর শিল্প ধ্বংসের ও কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এক ভূমিহীন মজদুর শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। সমাজে এই নূতন শ্রেণীর লোকের নানারূপ সমস্যা সরকারকে চিন্তিত করিয়াছে।

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসার যত দ্রুতই হউক না কেন, ভারত আজিও কৃষি-প্রধান দেশ। এখনও ভারতের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে ও কৃষিকার্য তাহাদের প্রধান উপজীবিকা। অতএব কৃষি ও কৃষকদের উন্নতি বিধানই শাসকদের বিশেষ লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য কতকগুলি আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। যাহাতে মহাজনদের কবলে পড়িয়া কৃষকদের সর্বনাশ না হয় তাহার জন্য সমবায় নীতিতে ঋণদান সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। উন্নত প্রথায় চাষ করিতে শিক্ষাদানের জন্য সরকারের কৃষি বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। কৃষি বিভাগের অধীনে কৃষি গবেষণাগার ও পরীক্ষামূলক কৃষি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ভারতের কৃষক এখনও ফসল লাভের জন্য বারিপাতের উপর নির্ভর করে। ভারতের নানাস্থানে গত একশত বৎসরের মধ্যে বহুবার

ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ উপশমের জন্য নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। গভর্ণমেন্টের সেচ বিভাগ খোলা হইয়াছে। অনুর্বর অঞ্চলগুলির মধ্য দিয়া খাল খনন করিয়া জল সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। জল একস্থানে সঞ্চিত করিয়া আবশ্যকমত শস্যক্ষেত্রে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বড় বড় বাঁধ তৈয়ারী হইয়াছে। এই সকল বাঁধের জল খাল দিয়া আবশ্যকমত শস্যক্ষেত্রে সরবরাহ করা হয়। সেচ ব্যবস্থা ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এখন ভারতে দুর্ভিক্ষ আর পূর্বেকার ন্যায় ভয়াবহ রূপ ধারণ করিতে পারে না।

সিপাহী বিদ্রোহের পর রেলপথের দ্রুত প্রসার হয় এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরস্পরের সহিত যুক্ত হয়। সম্প্রতি বহু রাস্তা নির্মাণের ফলে রেলগাড়ির সহিত মোটর বাস প্রতিযোগিতা করিতেছে। যে সকল স্থানে রেল লাইনের সাহায্যে পৌঁছানো যায় না, বাসযোগে সেই সকল স্থানে যাওয়া যায়। পরিবহন ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতির ফলে ভারতীয়দের মধ্যে একতাবোধ বৃদ্ধি পায় ও জাতীয়তা সংগ্রামের পক্ষে সুবিধা হয়।

পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি, শিক্ষার প্রসার, বেতার যন্ত্রের ব্যবহার, চলচ্চিত্রের প্রচলন, এই সকলের ফলে ভারতে গভীর সামাজিক পরিবর্তন হইয়াছে। জাতিভেদ জ্ঞান লোপ পাইয়াছে, অস্পৃশ্যদের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে, স্ত্রীজাতি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। স্ত্রীজাতি এখন কেবলমাত্র গৃহের অন্তরালে আবদ্ধ নহে। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাহারা বিশেষ অংশগ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে শিক্ষার দ্রুত প্রসারের ফলে তাহারা পুরুষের সহিত সর্বক্ষেত্রে সমান ভাবে তাল ফেলিয়া চলিতেছে। তাহারা সরকারী চাকুরী করিতেছে, চিকিৎসক হইতেছে ও আইন-ব্যবসায়ে যোগদান করিতেছে। পুরুষের সহিত তাহারা সমানভাবে ভোটের অধিকারী এবং রাষ্ট্রের কোনও পদ হইতে তাহারা বঞ্চিত নহে।

উচ্চশিক্ষা

ভারতের এই পরিবর্তন বহুলাংশে শিক্ষার প্রসারের ফল। পাশ্চাত্য শিক্ষার আরম্ভ ও এই শিক্ষার ফলে জাতীয়তাবোধের উৎপত্তি সম্বন্ধে

পঞ্চম পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথমে উচ্চশিক্ষার দিকেই কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি পড়ে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উচ্চশিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের মাধ্যমে দেশে শিক্ষার বিস্তার হইবে এই ধারণাতেই কর্তৃপক্ষ প্রথমে উচ্চশিক্ষার বিস্তারের প্রতি মনোযোগী হন। তাঁহাদের ধারণা ভুল হয় নাই। উচ্চশিক্ষিত লোকেরাই শিক্ষার আলোক দেশে সর্বত্র ছড়াইয়া দেয়। তাহারা বহু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে। প্রতি জেলায় অন্ততঃ একটি বিদ্যালয় স্থাপন সরকারের উদ্দেশ্য হয়। কিন্তু বহু বিদ্যালয় বেসরকারী চেষ্টায় স্থাপিত হয়। ছাত্রসংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। নানা স্থানে বহু বেসরকারী কলেজও গড়িয়া উঠিতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেবলমাত্র পাঠ্যক্রম নির্ধারণ ও পরীক্ষা গ্রহণ করিত। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের Indian Universities Act বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে স্নাতকোত্তর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার ও গবেষণা পরিচালনা করিবার ক্ষমতা প্রদান করে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই সুবিধা গ্রহণ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ স্নাতকোত্তর বিভাগ গঠন করেন ও বহু মেধাবী ছাত্রদের মৌলিক গবেষণা কার্যে নিযুক্ত করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে উপযুক্ত ব্যবস্থার সুপারিশ করিবার জন্য স্যার মাইকেল্ স্যাড্‌লারের নেতৃত্বে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই কমিশনের সভ্য হিসাবে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। এই কমিশন কতকগুলি সুপারিশ করে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সেইগুলি কার্য্যকরী করে নাই।


স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

এই সময়ে অনেকগুলি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিশ্ব-

বিদ্যালয়গুলির মধ্যে কয়েকটির গঠন পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভিন্ন হইল। পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এক সমাজভুক্ত (affiliate) করিয়াছিল। অধিকাংশ নূতন বিশ্ববিদ্যালয় হইল ঐকিক (unitary), অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় মর্যাদাভোগী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা ছিল লাহোর হইতে রেঙ্গুন পর্যন্ত। কলম্বো ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে ক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা সঙ্কুচিত হইতে থাকে, কিন্তু এই সঙ্কুচিত এলাকার মধ্যেও বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও ছাত্র-সংখ্যা এইরূপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব হ্রাস প্রাপ্ত না হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বর্তমানে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭।

সাহিত্যে ও ললিতকলায় জাতীয়তার প্রভাব ঃ—

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে নবজাগরণ দেখা দেয় তাহার ফলে ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে বহু রচনা প্রকাশিত হয় ও এই সকল ভাষায় নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এই সাহিত্যের মধ্যে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হয়। বাংলা সাহিত্যে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই নূতন ভাবধারার প্রবর্তন করিয়া পরবর্তী লেখকদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁহার শিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মিনী কাব্যে আক্ষেপ করেন—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে,
কে পরিবে পায় ?"

তাঁহার দেশপ্রীতি ও ব্যক্তিচেতনার এই অভিব্যক্তি বঙ্গসন্তানের সুপ্তি ভঙ্গ করে ও স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে। তাঁহার পর আবির্ভূত হ'ন সর্বপ্রকার বন্ধন বিদ্রোহী কবি মধুসূদন দত্ত। মেঘনাদ বধ

কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলির মাধ্যমে মধুসূদন দেশাত্মবোধের স্পষ্ট পরিচয় দেন। তাঁহার পর কাব্য জগতে উদিত হন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র। কবি হেমচন্দ্র বাঙ্গালী জাতিকে উদ্দীপিত করার চেষ্টায় বলেন,

"বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসে ও নানা প্রবন্ধের মাধ্যমে তাঁহার দেশভক্তি ও হিন্দু-রাজ্য সংস্থাপনের কল্পনা প্রকাশ করেন। তিনি স্বদেশকে আরাধ্যা দেবী রূপে পূজা করিতে বাঙ্গালীকে শিক্ষা দেন। তাঁহার 'আনন্দমঠ' বাংলায় বিপ্লবী দলের ধর্মগ্রন্থ হয় ও তাঁহার রচিত 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজমন্ত্র হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার উপন্যাসের সাহায্যে ভারতের লুপ্ত গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দেন ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার উদাত্ত সঙ্গীতে বঙ্গ জননীর দৈন্য ঘুচাইবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসংখ্য রচনার মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও স্বাজাত্যাভিমান প্রচারিত হয়।

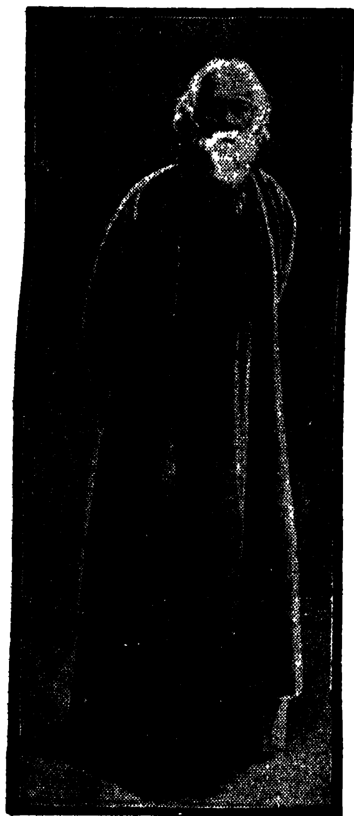


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় রচনার মধ্যেও দেশাত্মবোধ প্রকাশ পায়। মহম্মদ ইকবালের উর্দ্দু ভাষায় রচিত 'হামারা সোনে কি হিন্দুস্থান' ভারতের সর্ব্বত্র জনগণের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়।

চিত্রকলায়, সঙ্গীতে ও নৃত্যশিল্পেও ভারতের এই নবযুগের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চাত্যের অনুকরণ ত্যাগ করিয়া ভারতের প্রাচীন

পদ্ধতির অনুসরণ চিত্রশিল্পীদের আদর্শ হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক নূতন শিল্পী গোষ্ঠী গঠন করেন। নন্দলাল বসু, আবদুর রহমান চাঘতাই সারদাচরণ উকিল প্রভৃতি শিল্পীগণ নূতন আদর্শে তাঁহাদের সৃজনীশক্তি ব্যবহার করেন। প্রাচীন ভারতের নৃত্যকলার অনুশীলনে বহু শিল্পী মনোযোগী হন এবং ভারতীয় কৃষ্টির এই শাখাও প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণে নব সমৃদ্ধি লাভ করে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা ও লোক সঙ্গীতের পুনরুদ্ধারের চেষ্টাও আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথ উচ্চাঙ্গ ও লোক-সঙ্গীতের সমন্বয়ে সঙ্গীতের এক নূতন ধারার প্রবর্তন করেন। ভারতীয় চিত্রকলা, নৃত্যকলা ও কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত পুনরুজ্জীবনের ফলে ভারতীয় কৃষ্টি এখন জগতের সর্ব দেশে সমাদৃত হইয়াছে ও স্বাধীন ভারতকে বিশ্বের দরবারে এক বিশেষ আসন দান করিয়াছে।


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতীয় ঐতিহাসিকদের চেষ্টায় ভারতের গৌরবময় ইতিহাস নূতন আকারে জগতের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে। ভারতীয় দর্শনে, শাস্ত্রে ও সংস্কৃত সাহিত্যে নিহিত অতুল ঐশ্বর্য সমক্ষে পুনরুদ্ঘাটিত হইয়া বিশ্বকে চমৎকৃত করিয়াছে। কবির স্বপ্ন,—"ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে"—বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছে।